বৃষ্টি পতনের শব্দ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

অতীশ আর নীলাঞ্জনার মেয়ের জন্মাবার দিনটার কথা আমার আজও মনে আছে। সে কী নিদারুণ উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা! নীলাঞ্জনার তখন শরীর ভাল ছিল না, আর সে যে মা হতে পারবে, এটাও ছিল বিস্ময়কর ব্যাপার। নীলাঞ্জনার ধারণা হয়েছিল, প্রসবের ধকল সে সইতে পারবে না, সে বাঁচবে না, তবু সে জেদ ধরেছিল, সে তার জীবনের ঝুঁকি নিয়েও মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করে যাবে। যদি এমন সংকট হয় যে, জননী ও সন্তানের মধ্যে অন্তত একজনকে বাঁচানো যাবে, তা হলে যেন সন্তানটিকেই বাঁচিয়ে রাখা হয়, এই কথা বলেছিল বারবার। এই জন্য আগে থেকেই সে ছেলে ও মেয়ের দুটি নাম লিখে রেখেছিল। সেই লেখার কপি দিয়েছিল চারজনকে, তাদের মধ্যে আমি একজন। অপরাজিত আর অপরাজিতা।

ডাক্তারদেরও নীলাঞ্জনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আশঙ্কা ছিল কিছুটা। তিন মাসের সময়ে একবার গর্ভপাতের সামান্য ইঙ্গিত দেওয়াতেই নীলাঞ্জনা প্রবল আপত্তি করেছিল তো বটেই, রাগ আর

কান্নায় তার শরীর আরও খারাপ হয়ে পড়েছিল। এমনকী ডাক্তারদের ওপর সন্দেহ করে সে কোনও ওষুধও খেতে চাইত না। তখন তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করেন ওর বেলামাসি। বেলামাসিও ডাক্তার, তাঁর ওপর নীলাঞ্জনার অগাধ বিশ্বাস।

অতীশ তখন বাঁকুড়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। আমিও সেই সময় ওখানকার ক্রিশ্চিয়ান কলেজে পড়িয়েছি কিছুদিন। ছাত্রজীবনে অতীশ আমার থেকে দু'বছরের সিনিয়র ছিল, পরে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আমরা দু'জনেই শহুরে মানুষ। কলকাতা ছেড়ে বাইরে চাকরি করতে এসে, একজন পুরনো বন্ধুকে পেয়ে গেলে দিনযাপন অনেক আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

অতীশের দারুণ দাবা খেলার নেশা, সারা দিনে শত ব্যস্ততা, তবু সন্ধের পর একবার না একবার সে দাবা নিয়ে বসবেই। আমি তার সঙ্গী। ওর তুলনায় আমি কাঁচা খেলোয়াড়। মনঃসংযোগের অভাবে মাত হয়ে যেতাম বারবার। আমাকে হারিয়েই অতীশ খুব আনন্দ পেত। শেষের দিকে অবশ্য আমি ওর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলাম। অতীশকে অনেকক্ষণ মাথা চুলকোতে হত, শেষ পর্যন্ত একটা ভুল চাল দিয়ে নিজের চুলের মুঠি চেপে ধরে বলত, ওঃ ওঃ! যেন ওর পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। বরুণার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার পরেই যেন আমার মনঃসংযোগ বাড়তে শুরু করে এই খেলায়। কিংবা এ দুইয়ের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কি না, তা জানি না।

অতি সাবধানতার জন্য একদিন পেটে সামান্য ব্যথা উঠতেই নীলাঞ্জনাকে ভর্তি করে দেওয়া হল হাসপাতালে। অতীশ অবশ্যই তার স্ত্রীকে কলকাতার কোনও নামজাদা নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু নীলাঞ্জনাই যেতে চায়নি। বাঁকুড়ার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বেশ নাম আছে, কলকাতার সরকারি হাসপাতালের বড় বড় ডাক্তাররা এখানে বদলি হয়ে আসেন। তা ছাড়া, বাঁকুড়ার জেলা সমাহর্তার স্ত্রী হিসেবে নীলাঞ্জনা যতখানি খাতির-যত্ন পাবে, কলকাতায় শুধু টাকা খরচ করে কি তা পাওয়া যায়? জেলার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কতখানি প্রতাপ, তা তো আমি নিজেই দেখেছি, কলকাতায় তাদের কে চেনে?

সেই প্রথম ব্যথার পর, তিনদিন একেবারে চুপচাপ। ডাক্তাররা নীলাঞ্জনার স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে সিজারিয়ান করতেও চান না। বেলামাসিরও সেটাই অভিমত। তারিখ হিসেব করে তিনি বাঁকুড়া এসেছেন ছুটি কাটাতে। তিনি দু' বেলা দেখতে যাচ্ছেন। তিনি বাইরের ডাক্তার, তবু নীলাঞ্জনার ডেলিভারির সময় তিনি কাছে থাকবেন সর্বক্ষণ।

নীলাঞ্জনা শুধু শুধু শুয়ে থাকছে হাসপাতালের ক্যাবিনে, তাই পরের দিন তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হবে ঠিক হল। সন্ধেবেলা তাকে দেখে আসার পর, আমি আর অতীশ বসলাম দাবার ছক পেতে। সঙ্গে হুইস্কি আর ডিমভাজা। অতীশ কক্ষনো দু'পেগের বেশি খায় না, শুধু স্বাস্থ্যের নিয়ম মানার জন্যই নয়, রাত্তিরের দিকেও হঠাৎ তার কর্তব্যের আহ্বান আসতে পারে। তাছাড়া মন্ত্রীরাও যখন তখন এসে হাজির হয়। মন্ত্রীদের সামনে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ম্যাজিস্ট্রেটকেও রামভক্ত হনুমানের মতন দুটি অমূল্য হাত জোড় করে থাকতে হয়।

আমি অবশ্য তেমন সংযমী নই। অতীশের বোতল আমিই অনেকটা শেষ করি। এরমধ্যে আমার যে কিছুটা হ্যাংলামি আছে বুঝতে পারি। এখনকার মতন, সে সময় কলেজের মাস্টারদের মাইনেপত্র মোটেই ভাল ছিল না, নিজের পয়সায় ভাল জাতীয় মদ্যপান করার ক্ষমতাও ছিল না।

কলেজের মাস্টারদের প্রকাশ্যে মদ্যপান শোভনও নয়, বিশেষত মফঃস্বলে, তাই অন্য কারুর সামনে আমি গেলাস ধরতাম না, শুধু অতীশের কাছে এলেই অনেকটা পান হয়ে যায়। অতীশ ঝুরো ঝুরো করে ডিম ভাজা খুব পছন্দ করে, খেলার সময় প্লেটের পর প্লেট ডিমভাজা আসে, আমার আবার ডিম সহ্য হয় না, তবু খেতে হয়।

প্রথম খেলাটায় অতীশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আমাকে মাত করল। আগে আধ ঘণ্টার বেশি লাগত না। দ্বিতীয়বারের ছক সাজাতে সাজাতে অতীশ বলল, তুই বোড়ের চাল বেশ ভালই শিখেছিস দেখছি।

আমি বললাম, তোমাদের ভাই মন্ত্রী আর হাতি-ঘোড়া নিয়েই কারবার, আমরা সাধারণ মানুষ। আমরা বোড়ের দলে।

অতীশ হেসে বলল, দাবা খেলার মধ্যে অনেক রূপক আসে। জীবনের অনেক কিছুই দাবার ছক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। ভগবানও যেন মানুষের জীবন নিয়ে দাবা খেলছেন!

আমি বললুম, এটা তুই ভুল বললি। আইনস্টাইনের কথাটা মনে নেই, ঈশ্বর দাবা খেলেন না।

অতীশ বলল, সেটা বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে। মানুষের জীবন বিষয়ে খাটে না। এই দেখ না, আমাদের চোদ্দো বছর বিয়ে হয়েছে, এতদিন নীলা কনসিভ করেনি, দু'জনেই বড় বড় স্পেশালিস্ট ডাক্তার দেখিয়েছি, দু' জনেরই সে রকম কোনও খুঁত নেই। তবু, বছরের পর বছর, মানে যখন একেবারে আশা ছেড়ে দিয়েছি, ইদানীং ও কথায় ভাবতামই না আমরা দুজনে, আমাদের ক্ষোভও মিটে গিয়েছিল। তবু হঠাৎ...একে ভগবানের দয়া ছাড়া আর কী বলা যায়!

আমি বললাম, এজন্য ভগবানকে টানাটানি না করে, এর একটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত, বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আছে। তোরা কেন সেটা মানতে চাস না?

অতীশ ছিল বিজ্ঞানের ছাত্র, আমি অর্থনীতির। আইএএস পরীক্ষা দেবার আগে অতীশ ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। আমি কট্টর নাস্তিক আর অতীশ কয়েক বছর ধরে ঝুঁকেছে ধর্মের দিকে। এমনকী পুজো-আচ্চাও করে। বামুনের ছেলে, আগে পৈতে টৈতে কিছু ছিল না, বছর চারেক আগে নতুন করে উপবীত ধারণ করেছে।

সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ পাল্টে অতীশ জিজ্ঞেস করল, তুই বরুণাকে খুব কষ্ট দিয়েছিস, তাই না?

আমার জীবনের এই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে না চাইলেও, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের তো নিষেধ করা যায় না। তাই বললাম, হয়তো কষ্ট দিয়েছি, না বুঝে। নিজেও কষ্ট কম পাইনি। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল কী জানিস? ভুল বোঝাবুঝি। তবু মানুষ এই ভুল করবেই। যখন সেটা বোঝা যায়, তখন আর কিছু করার উপায় থাকে না। দাবার চাল তবু ফেরত নেওয়া যায়, কিন্তু জীবনের ভুল...

অতীশ বলল, দেখলি, আবার সেই দাবার উপমা।

দ্বিতীয় বাজি যখন বেশ জমে উঠেছে, তার মধ্যে লম্বা একটা বিদ্যুতে ঘরটা ঝলমল করে ওঠার পরেই বিরাট বজ্র গর্জন। প্রায় কানে তালা লেগে যাবার মতন। একটু পরেই নবীন সেনের কবিতার মতন, 'আবার আমার সেই কামান গর্জন!' শোঁ শোঁ ঝড়ের আওয়াজ, বাবুয়া নামে কাজের লোকটি এল জানলা বন্ধ করতে।

পুরনো আমলের ম্যাজিস্ট্রেটের কোয়ার্টার, কতগুলো ঘর আছে তার ঠিক নেই। মে মাসের শেষ, ক'দিন ধরে প্রচণ্ড গরম চলছে, এই সময় ঝড়-বৃষ্টি হবার কথা নয়, মৌসুমি বায়ু এসে আঘাত করবে আরও অন্তত দিন দশেক পর।

অতীশ বাবুয়াকে জিজ্ঞেস করল, অভি কী করছে রে? ওকে খাইয়ে দিয়েছিস?

সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে এল অভি। অতীশ-নীলাঞ্জনার বড় ছেলে, সাড়ে তিন বছর বয়েস, হাফ-প্যান্ট ও গেঞ্জি পরা। হাতে একটা কাঠের তলোয়ার।

অতীশ তাকে দেখে বলল, কী রে, ভয় পেয়েছিস নাকি? আয়, আমার কাছে এসে বোস!

অভি সে কথা না শুনে বলল, বাবা, বাবা, ইন্দ্রজিতের সঙ্গে লক্ষ্মণের যুদ্ধ লেগেছে। তুমি কার দলে?

অতীশ বলল, আমি রাম-লক্ষ্মণের দলে।

অভি তেজের সঙ্গে বলল, আমি রাবণের দলে।

অতীশ বলল, তাহলে তো তুই হারবি?

অভি বলল, সে তো একবার হেরেছিল। এবারে হারবে না। এই দেখো না যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনই আবার হাতের তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে বেরিয়ে গেল।

অতীশ আমাকে বলল, দেখলি, একটুও ভয়ডর নেই। ছোটবেলায় আমি বাজের শব্দে এমন ভয় পেতাম, মায়ের কাছে গিয়ে বসে থাকতাম গুটিসুটি মেরে।

আমি বললাম, এমন ঝড় বৃষ্টি শুরু হল, বাড়ি যাব কী করে?

অতীশ ধমক দিয়ে বলল, বোস তো! তোর এত বাড়ি ফেরার ঘটা কীসের? কেউ অপেক্ষা করে বসে আছে? আমার গাড়ি পৌঁছে দেবে, কিংবা রাত্তিরটা এখানেই থেকে যাবি।

আমার ভাড়া করা ফ্ল্যাটে আর কেউ নেই, এমনকী কাজের লোকটিও রাত্তিরে থাকে না। কিন্তু নিজের বিছানায় না শুলে, আমার ঘুম আসতে চায় না।

ঝড় বৃষ্টি বেড়েই চলেছে। তারই মধ্যে বেজে উঠল টেলিফোন।

এক দিকের কথা শুনেই বুঝতে পারা যায়। নীলাঞ্জনার খুব ব্যথা শুরু হয়েছে। ডেলিভারির আর দেরি নেই, এক্ষুনি যেতে হবে হাসপাতালে।

ফোনটা নামিয়ে রেখে বিহ্বলভাবে আমার দিকে তাকিয়ে অতীশ বলল, শুরু হয়ে গেছে!

তারপর ও একটা অদ্ভুত কথা বলল, অনেকটা আপন মনেই, আমরা কি এই দানটা শেষ করে যাব?

যার অসুস্থ স্ত্রী বেশি বয়েসে প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে যাচ্ছে, জরুরি ডাক পেয়েও সে কি দাবার দান শেষ করার কথা চিন্তা করতে পারে? এক্ষুণি লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে পড়ার কথা নয়?

এটা ঠিক দায়িত্বহীনতা কিংবা খেলার নেশাও নয়। বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত আসার পর এরকম হতেও পারে। অনিশ্চিত বাস্তবের মুখোমুখি হবার দ্বিধা।

আমি ওর বাহুতে চাপড় মেরে বললাম, না। খেলা থাক। যেতে হবে!

সঙ্গে সঙ্গে অতীশের শরীরটা স্প্রিং-এর মতন চঞ্চল হয়ে গেল। দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে ডাক দিল বাবুয়াকে।

বাবুয়ার কাছে জানা গেল, বেলামাসি আজ হাসপাতালের কাছেই এক ডাক্তারের বাড়িতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গেছেন। নিশ্চয়ই খবর পেয়ে গেছেন এতক্ষণে।

অভির খাওয়া হয়ে গেছে, তাকে শুইয়ে তার ঘরেই বাবুয়াকে রাত্রে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হল!

ড্রাইভারকে ডাকারও ত্বর সইলো না অতীশের। নিজেই বসল গাড়ির স্টিয়ারিং-এ। আমাকে পাশে বসিয়ে বিড়বিড় করে বলল, আজই এমন ঝড় বৃষ্টি শুরু হল!

এইসব রাতেই প্রকৃতির অস্তিত্ব প্রবলভাবে টের পাওয়া যায়। বদলে যায় শহর-গ্রামের চেহারা, মানুষের তৈরি করা কোনও শব্দের সঙ্গে ঝড় ও বৃষ্টির শব্দের কোনও তুলনা চলে না। আকাশ অদৃশ্য। রাস্তার বাতি নিভে গেছে, উপড়ে পড়েছে কয়েকটা গাছ। তবু বৃষ্টির রাত আমার ভাল লাগে। খুব ভালবাসি আকাশ থেকে জল নেমে আসার শব্দ।

একটা গাছ পড়েছে বড় রাস্তায় আড়াআড়ি, গাড়ি যেতে পারবে না।

ভূত দেখার মতন মুখ করে আমার দিকে ফিরে অতীশ বলল, অংশু, এখন কী হবে?

মাঝে মাঝে প্রকৃতির এরকম বিপর্যয়, অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু ধর্ম সচেতন অতীশ যেন এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছে দৈবের কোনও অশুভ ইঙ্গিত। নীলাঞ্জনা বাঁচবে তো? সেই জন্যই তার মুখখানা অমন পাংশু হয়ে গেছে।

আমার নিজের যদি স্ত্রী থাকত, সে যদি এরকম দিনে সংকটজনক অবস্থায় পড়ে থাকত হাসপাতালে, তাহলে আমার মনের অবস্থাও কি এরকম হত? কী জানি! এক গাড়িতে পাশাপাশি বসে থাকলেও, দু'জনের মনোভাব দু'রকম হতে বাধ্য। আমি ভাবছি, এত চিন্তার কী আছে? ঝড়-বৃষ্টিতে হাসপাতালের কাজ থেমে থাকে না। ম্যাজিস্ট্রেটের বউকে অবহেলায় ফেলে ঘুমোতে যাবে না কেউ, আর হাসপাতালে নিশ্চিত জেনারেটর আছে। বড় গাছটা পড়ে রাস্তা আটকে দিলেও পাশের মাঠটা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়, সেটা অতীশ দেখতে পাচ্ছে না কেন?

হাসপাতালে পৌঁছে শুনলাম, নীলাঞ্জনাকে নেওয়া হয়েছে ওটি-তে অনেকক্ষণ আগেই, বলতে গেলে এখানকার সব ডাক্তার ভিড় করেছে সেখানে, বেলামাসি তো আছেনই। কিন্তু একজন নার্স অতীশের পথ আটকে দিল। তার এখন ভেতরে যাওয়া নিষেধ।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে কতবার জেলার মানুষের চলাচলের অধিকার বন্ধ করে দিতে পারেন, কিন্তু হাসপাতালে তাঁর সেই জারিজুরি খাটে না। এখানে তিনি নিয়মের নিয়মে বন্দি।

তিন বছর আগে ধূমপান ছেড়ে দিয়েছে, তবু আমাকে বলল, একটা সিগারেট দে তো অংশু!

সেটা ধরিয়ে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে লাগল। আমি বললাম, অমন ছটফট করিস না, চুপ করে বোস! বরং তোর ভগবানকে ডাক।

'তোর' কথাটার সামান্য খোঁচা অগ্রাহ্য করে অতীশ বলল, যারা ভগবানকে মন-প্রাণ দিয়ে ভক্তি করে, তাদের জীবনেও এমন আঘাত আসে কেন?

যেন আঘাত আসবেই, ও ধরে নিয়েছে। এটা আমিও মেনে নিতে পারি না। এ তো ভগবানের প্রতি অবিচার। ভগবানের দয়ায় যেমন মানুষ বাঁচে না, তেমনই ভগবানের অবহেলাতেও মানুষ মরে না। কোনওটার জন্যই তাঁকে দায়ী করা ঠিক নয়।

বসে পড়ার পরও অতীশের ঠোঁট নড়তে লাগল একটু একটু। বোধহয় মনে মনে প্রার্থনা করছে। মন্ত্র-টন্ত্রও পড়তে পারে। তবে ওর বিশ্বাস যে অনেকখানি আহত হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এরকম সময় কথা বলার কিছু থাকে না, চুপ করে বসে থাকতে থাকতে আমার এক সময় ঝিমুনি এসে গেল। মাঝে মাঝে চোখ মেলে দেখছি, অতীশ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। ওর এখন ঘুম আসবে কী করে? সন্তানটি ঠিক মতন জন্মাবে কি না! জন্মালেও সে মাতৃঘাতী হবে কি না! তার এখনও ঠিক নেই। বন্ধুর প্রতি আমার যতই সম-ভ্রাতৃত্ব থাক, ওর উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা কিছুতেই আমার হতে পারে না, তাই আমি ঝিমুনি দমন করতে পারছি না।

অবশেষে, প্রায় ভোর রাত্রে সুসংবাদের দূতী হয়ে এলেন বেলামাসি। তাঁর পেছনে হাসপাতালের কয়েকজন নার্স ও ডাক্তার ভিড় করে আছেন। তিনি শান্ত গলায় বললেন, তোমার একটি মেয়ে হয়েছে অতীশ। নীলাঞ্জনা ভাল আছে। বাচ্চাটার ওজন হয়েছে সাত পাউন্ড।

অতীশ প্রথমেই উঠে গিয়ে প্রণাম করল বেলামাসিকে পায়ে হাত দিয়ে। তারপর দু হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল।

এসব খুঁটিনাটি আমার নজর এড়ায় না। আগে মানুষকে প্রণাম করে, তারপর অতীশ প্রণাম জানাল ভাগবানকে?

এই সময় রসশাস্ত্রের একটা উদাহরণ মনে পড়ল আমার। খুব সম্ভবত আনন্দবর্ধনের রচনায় আছে। এক জায়গায় কয়েকজন বন্ধু ও প্রতিবেশী বসে গল্প করছে, এক সময় বাইরে থেকে একজন এসে তাদের মধ্যে একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, এইমাত্র তোমার একটি পুত্রসন্তান জন্মেছে। এই যে সংবাদ, তা ওই বিশেষ লোকটির কাছে যতখানি বিশুদ্ধ আনন্দের, অন্যদের কাছে তা হতে পারে না। এই রস সর্বজনীন নয়, সকলের কাছে সহৃদয়-হৃদয়-সম্বন্ধীও বলা চলে না।

অতীশ এখন জামার হাতায় চোখ মুছছে। নীলাঞ্জনা ও নবজাতিকা দুজনেই ভাল আছে শুনে, আমারও অবশ্যই খুব আনন্দ হয়েছে। কিন্তু আমার চোখে জল আসবে না। অতীশের আনন্দ তিন রকম, নীলাঞ্জনা বেঁচে আছে। সে যে বাঁজা নয়, তার প্রমাণ দিতে পেরেছে, আর অতীশও পিতৃত্বের ক্ষমতা প্রামাণ করেছে।

শুধুমাত্র একবার দরজা থেকে উঁকি মেরে দেখার অধিকার পেয়ে অতীশ ওপরে গেল অন্যদের সঙ্গে। আমি বসেই রইলাম।

অবধারিতভাবে আমার স্মৃতিতে চলচ্চিত্রের মতন ভেসে উঠল ওদের ছেলে অভির জন্মের সময়ের কথা।

তখন অতীশ পুরুলিয়ার ডি এম। আমিও কোনও কারণে সেইসময় গিয়েছিলাম পুরুলিয়ায়। কারণটাও মনে পড়েছে, কয়েক মাস আগেই

আমার পিতৃবিয়োগ হয়েছে, মনটা খুবই অস্থির ছিল।

বাবার মৃত্যু হয়েছিল অনেকটা চিকিৎসাবিভ্রাটে, সে জন্য নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিলাম না। আমার এক মামা সান্ত্বনা দেবার জন্য বলেছিলেন, যার যা নিয়তি, তুই আর কী করবি! তা শুনে আমার আরও গা জ্বলে গিয়েছিল। গুরুজন শ্রেণির লোকেরা যখন মূর্খের মতন কথা বলেন, তখন প্রতিবাদ করতে না পেরে ভেতরে রাগটা চাপা দিলেও ধোঁওয়া বেরুতে থাকে। নিয়তি আবার কী! অত হাই ব্লাড সুগার, তা না কমিয়ে কেউ রুগিকে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যায়? মামাদেরই চেনা ডাক্তার!

যাই হোক, অতীশ যখন যেখানে বদলি হয়, আমি সেখানেই গিয়ে থেকে আসি কিছুদিন। পুরুলিয়ার রুক্ষ প্রকৃতি, ছোট ছোট টিলা ও বিক্ষিপ্ত জঙ্গল আমার ভাল লাগে

পুরুলিয়া খরাপ্রবণ এলাকা, কিন্তু যখন বৃষ্টি নামে, তখন একটানা তিন-চার দিন চলে। সেই রকমই বৃষ্টি পড়ছে দু দিন ধরে, বাইরে বেরনো যায় না, অতীশেরও তেমন কাজের চাপ নেই, আমরা দুজনে অবিরাম দাবা খেলছি আর ডিম ভাজা খাচ্ছি।

তৃতীয় দিন সন্ধেবেলা একজন রিকশাচালক, একজন বৃদ্ধ আরোহীকে নিয়ে যেতে যেতে, বাজারের পাশে আবর্জনার স্তূপের মধ্যে কীসের যেন একটা শব্দ শুনতে পেল। প্রথমে মনে হয় কোনও জন্তু, কিংবা শকুনের বাচ্চা, তারপর বোঝা গেল, মানবশিশুর গোঙানি। বুড়ো মানুষরা কানে ভাল শুনতে পায় না, তার ওপর বৃষ্টির শব্দ, তবু সেই যাত্রীটি ঠিক শুনতে পেয়ে রিকশাচালককে বললেন, একটু দাঁড়া তো বাবা, দেখ তো ওটা কী?

বাজারের সব জঞ্জাল যেখানে ফেলা হয়, তারই এক পাশে পড়ে আছে শুধু কলাপাতা দিয়ে মোড়া একটি প্রাণ। ওঁয়া ওঁয়া শব্দ করছে। কলাপাতার জন্যই বৃষ্টিতে ভেজেনি।

বুড়ো মানুষটি বললেন, আহা রে, কৃষ্ণের জীব।

তাঁর আগ্রহেই রিকশাচালক সেই কলাপাতায় মোড়া জীবটিকে তুলে নিয়ে জমা দিল কাছাকাছি থানায়।

থানার লোকেরা পুটুলিটা খুলে দেখল, বাচ্চাটার বয়েস এক দিনের বেশি নয়। তখনও তার গায়ে লেগে আছে মাতৃ-আঠা ও রক্ত। কিন্তু বুকটা ধুক-পুক করছে, গলায় আছে স্বর। সব জন্তু-জানোয়ারের মতন মানুষ শিশুদের প্রতি দুর্বল। প্রকৃতিই এটা প্রাণীদের স্নায়ুতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। যে-পুলিশেরা নিষ্ঠুরভাবে অন্য মানুষদের মাথায় লাঠি চালায়, কিংবা সন্দেহবশে কারওকে ধরে এনে তার গায়ে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দেয়, এবং আরও নানা প্রকার নৃশংসতা দেখায় অবলীলাক্রমে, সেই পুলিশরাই সত্বর গরম জল এনে ধুয়ে মুছিয়ে দিল শিশুটিকে। পলতে ভিজিয়ে দুধ খাইয়ে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু থানার মধ্যে একটা সদ্যোজাত বাচ্চাকে আর কতদিন লালন-পালন করা যায়? পুরুলিয়ার একটি মাত্র অনাথআশ্রমে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা দুঃখের সঙ্গে জানালেন, অত ছোট বাচ্চাকে রাখার ব্যবস্থা তাঁদের নেই।

থানার এক জমাদারের স্ত্রীর তিনটি ছেলে-মেয়ে, তাদের একটির বয়েস মাত্র ছমাস, জমাদারের নাম গিরমিটিয়া যাদব, স্ত্রী বাসন্তী। এই বাসন্তী ডি এম সাহেবের বাড়িতে ঘর সাফটাফের কাজ করে। সেখানেই থাকার জায়গা পেয়েছে। থানার বড়বাবুর অনুরোধে গিরমিটিয়া যাদব বাচ্চাটাকে নিয়ে গেল বাসন্তীর কাছে, অন্তত কিছুদিনের জন্য রাখতে রাজি হয়।

ডি এম সাহেবের স্ত্রী একদিন শুনতে পেলেন সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে এক সঙ্গে দুটি বাচ্চার কান্না।

বিয়ের দশ বছর পরেও নীলাঞ্জনা তখনও নিঃসন্তান। ডাক্তারদের কাছে কোনও ভরসা না পেয়ে, সে তখন মন্দিরটন্দিরে মাথা ঠুকছে। অতীশও ঝুঁকেছে ধর্মের দিকে, নতুন করে পৈতে নিয়ে নারায়ণ পুজো করছে বাড়িতেই।

বাসন্তীর কাছে বাচ্চাটির ইতিহাস জানতে দেরি হল না নীলাঞ্জনার। ডি এম খবর দিলেন থানায়। কে বাচ্চাটিকে ফেলে গেছে, তার কোনও হদিশ নেই, এমনকী সেই রিকশা-চালকেরও নাম জেনে রাখা হয়নি।

নীলাঞ্জনা প্রায়ই সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে গিয়ে বাসন্তীর কাছে বসে থাকে। বাসন্তী তার নিজের কোলের বাচ্চাটির সঙ্গে, এই নামহীন বাচ্চাটাকেও স্তন্য পান করায়। একদিন নীলাঞ্জনা জিজ্ঞেস করল, বাসন্তী, তুই কি এই ছেলেটাকে তোর কাছেই রেখে দিবি?

বাসন্তী বলল, না মাইজি, আমি আমার নিজের তিনটাকেই সামলাতে পারি না। আর একটা মুখের খাওয়া জুটবে কী করে? থানা থেকে এক পয়সাও দেয় না। ঝিনিয়ার বাপকে বলেছি, একে ফেরত দিয়ে আসতে।

ঝিনিয়া ওর বড় মেয়ে, সে নাকি হিংসের চোটে এই বাচ্চাটাকে মাঝে মাঝেই চিমটি কেটে কাঁদায়।

বাসন্তী আরও জানাল যে, এটা পাপের সন্তান। নিচু জাতের এর মুখ তার বুকে ছোঁয়াতে হয় বলে, ঘেন্নায় তার গা ঘিনঘিন করে। গিরমিটিয়া জাতে গোয়ালা, তার বেশ জাত নিয়ে গর্ব আছে।

নীলাঞ্জনা তখন বলল, তা হলে বাচ্চাটা আমাকে দে।

সেই যে নীলাঞ্জনা শিশুটিকে কোলে তুলে নিল, আর কোল থেকে নামাতেই চায় না। বাজারের আঁস্তাকুঁড় থেকে থানায়, সেখান থেকে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের ঘুপচি ঘরে, তারপর সেখান থেকে বাচ্চাটা এসে স্থান পেল জেলার হর্তাকর্তার প্রাসাদে। এক বাৎসল্য-বুভুক্ষু রমণীর ক্রোড়ে।

নীলাঞ্জনা তার স্বামীর কাছে দাবি জানাল, সে এই শিশুটিকে দত্তক নেবে। অতীশ তাতে অরাজি নয়, কিন্তু রাস্তা থেকে একটা অজ্ঞাত পরিচয় শিশুকে তুলে আনলেই তাকে আইনগতভাবে সন্তানের স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। সে জন্য আদালতের অনুমতি লাগে। ঘটনাটি জানাজানি হবার পর, আরও তিনটি দম্পতি এই শিশুটিকে চেয়ে বসল, শেষ পর্যন্ত বিচারক যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দাবিকেই মান্য করবেন, তা স্বাভাবিক। এ বিচার অন্যায্যও নয়।

অতীশের শুভার্থী কয়েকজন অবশ্য বলেছিল, দত্তক নিতে হলে কলকাতার কোনও ভাল জায়গা থেকে নিয়ে আসুন না! আপনি ব্রাহ্মণ, এ বাচ্চাটা নিশ্চয়ই কোনও কুলি-কামিনের। গায়ের রং দেখছেন, ঝিরকুট্টি কালো। বড় হলে দেখবেন, কিছুতেই লেখা-পড়া মাথায় ঢুকবে না, বদ হবে, তখন কত অসুবিধেয় পড়বেন....।

অতীশ একটু দুর্বল হলেও, নীলাঞ্জনা এসব কিছুই মানতে চায়নি। সে বলল, কালো হলে কী হয়, মুখখানা দেখ, ঠিক কেষ্ট ঠাকুরের মতন। টানা টানা চোখ, আর নাক...। শ্রীকৃষ্ণ কি ব্রাহ্মণ ছিলেন?

আমি এসব ঘটনারই নীরব দর্শক।

শুধু আদালতে যখন বিষয়টি ওঠে, তখন বাচ্চাটির একটি নাম ঠিক করার প্রশ্ন উঠেছিল। নথিপত্রে একটা নাম রাখতে হবে তো। তখন আমি অতীশকে বলেছিলাম, ওর নাম রাখ সত্যকাম!

এই নামের তাৎপর্য তখনই বোধহয় খেয়াল করেনি অতীশ। সে বলল, না রে আমি আগেই ঠিক করে রেখেছি। নাম হবে অ দিয়ে। অভিনব। অভিনব বন্দ্যোপাধ্যায়, শুনতে ভাল না?

সবাই তাকে অভি বলেই ডাকে। অতি দুরন্ত, ছটফটে ছেলে হয়েছে সে।

দুই

ধর্ম নিয়ে তর্ক চলে না, বিজ্ঞান নিয়ে চলে। ধর্মটা বিশ্বাসের ব্যাপার, বিজ্ঞানকে হতে হয় যুক্তিসিদ্ধ, প্রমাণসিদ্ধ।

আমি অতীশের ঈশ্বরভাবনা নিয়ে কোনও আলোচনায় যেতে চাই না। আমাদের বিতর্ক হয় ডারউইন এবং বিবর্তনবাদ নিয়ে।

কন্যাসন্তানটি জন্মাবার কিছুদিন পর, এই বিতর্ক আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। অতীশের ধারণা, ঈশ্বরের কৃপাতেই ওদের মেয়েটি জন্মেছে, আগের ছেলেটিও ঈশ্বরের অবদান, কারণ সে দু'জনকেই

সমানভাবে ভালবাসে।

এতে আমার আপত্তির কোনও কারণ নেই। এটা তো বিশ্বাসের ব্যাপার, এই বিশ্বাস নিয়ে যদি কেউ খুশি থাকতে পারে, থাকুক না! কিন্তু এর পরেও অনেক কাঠি ওপরে গিয়ে যখন সে বলে, সমস্ত মানুষই ঈশ্বরের সৃষ্টি, তখন আমার হাসি পায়।

আমি তাকে রাগাবার জন্য বলতাম, দেখ ভাই, আমি কিন্তু ঈশ্বরের নয়, আমার বাবা-মায়ের ক্রোমোজোমের সৃষ্টি। আমার বাবা যদি আমার মায়ের বদলে অন্য কোনও মহিলাকে বিয়ে করতেন, কিংবা আমার মা অন্য কোনও পুরুষকে, তাহলে এই আমি আর আমি হতাম না। এটা বদলাবার ক্ষমতা, তোমাদের ঈশ্বরেরও নেই। আর আমার বাবা-মায়ের বেশ কয়েকটা চোদ্দো পুরুষ আগের পূর্বপুরুষরা যে বাঁদর কিংবা শিম্পাঞ্জি ছিলেন, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। বিজ্ঞান এটা প্রমাণ করে দিয়েছে।

অতীশ ছিল বিজ্ঞানের অতি মেধাবী ছাত্র, আমি পড়েছি সাহিত্য ও অর্থনীতি, তাও মাঝারি ধরনের ছাত্র, আর এখন শখের বিজ্ঞান পাঠক। অথচ আমি অতীশকে বিজ্ঞান বোঝাবার চেষ্টা করব, এটা অদ্ভুত ব্যাপার না?

খুব একটা অদ্ভুত নয়। পৃথিবীর বহু শিক্ষিত মানুষ, তঁদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞানীও আছেন, বিবর্তনবাদ তত্ত্বকে তাঁরা দু চক্ষে দেখতে পারেন না। এমনকী আমেরিকার মতন বিজ্ঞান, কারিগরি, প্রযুক্তিতে এত উন্নত দেশ, সেখানেও বহু কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ আছে। আমেরিকার অনেক স্কুলে বিবর্তনবাদ পড়াতেই দেওয়া হয় না। তাদের কাছে ডারউইন একটা নিষিদ্ধ নাম। ধর্ম-বিশ্বাস একেবারে দৃঢ়নিবদ্ধ হলে বিবর্তনবাদ মানবেই বা কী করে? কোনও খাঁটি খ্রিস্টানের পক্ষেই বাইবেলকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। বাইবেল অনুযায়ী ঈশ্বর নিজের হাতে আদম আর ইভকে গড়েছেন। বাচ্চা-টাচ্চা হিসেবে নয়, একেবারে পূর্ণাঙ্গ তরুণ-তরুণী রূপে। তাও মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে। মুসলমানরাও আদম-ইভকে মানে। হিন্দুদের সে রকম কোনও তত্ত্ব নেই। মনু নামে এক ঋষির বংশধররাই মানব। সেই মনু এলেন কোথা থেকে। তিনি নাকি স্বয়ম্ভর, অর্থাৎ নিজে নিজেই তৈরি হয়েছেন, আসলে হিন্দুদের তো কোনও অবশ্যমান্য নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ নেই। আছে কিছু চমৎকার কাব্যকাহিনি ও দর্শন। খ্রিস্টানদের বাইবেল, মুসলমানদের কোরান আছে বলেই দু-এক শতাব্দী আগে হিন্দুরা বলতে শুরু করে যে তাদের ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে বেদ। ওটা একেবারেই গুজব। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই বলেছিলেন, বেদ হচ্ছে পলগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারির মতন বিভিন্ন কবির একটি বৈদিক ভাষার কাব্য সংকলন! বেদ সম্পর্কে এক অক্ষরও জানে না, এমন কোটি কোটি মানুষও জন্মসূত্রে হিন্দু থাকতে পারে। কিন্তু একজন মুসলমান একেবারে নিরক্ষর হলেও, কোরান সম্পর্কে কিছু না কিছু জানবে। যেমন অতি মূর্খ খ্রিস্টানও বাইবেল সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ হতে পারে না।

ততটা ধর্ম-গোঁড়া নয়, মধ্যমানের অনেক শিক্ষিত মানুষও বিবর্তনবাদকে ঠিক হজম করতে পারে না। সামান্য এক কোটি প্রাণী থেকে পৃথিবীর এত বৈচিত্র্যময় প্রাণী-জগতের উদ্ভব হয়েছে, এটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। একই প্রাণপ্রবাহের ধারায় সমুদ্রের বিশাল তিমি মাছ, ভূপৃষ্ঠের বাঘ-সিংহ-হাতি, গাছের বাঁদর আর বাড়ি-ঘর তৈরি করা মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, একথা ভাবতেও যেন তারা ভয় পায়। বিশেষত বাঁদরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা যেন একেবারেই রুচিসম্মত নয়।

অতীশ আমাকে বলে, তুই যে প্রমাণ প্রমাণ করিস, ইভোলিউশান থিওরির অকাট্য প্রমাণ কোথায়? ডারউইন সাহেব গোলোপাগোস দ্বীপে গিয়ে কী সব অদ্ভুত প্রাণী টানি দেখেছেন। তার সঙ্গে নিজের কল্পনা মিশিয়ে একটা মোটা বই লিখেছেন বলেই সেটা প্রমাণ হিসেবে ধরতে হবে?

অতীশ ফিজিক্স পড়েছে, বায়োলজি পড়েনি। কিন্তু এ তো আজকাল সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার। তবু আমাকে বলতে হল, বিজ্ঞানে ধরাটরার ব্যাপার নেই। ল্যাবরেটোরিতে পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে হয়। ঈশ্বরের সৃষ্টির ব্যাপারটাই প্রমাণ করবার কোনও উপায় নেই, ধর্মগ্রন্থের ওপরই নির্ভর করতে হয়। ধর্মগ্রন্থগুলি যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা পাঁচ-সাত হাজার বছর আগেকার জগৎ সম্পর্কে কিছু ভাবতেই পারতেন না। কিন্তু বিবর্তনবাদের ইতিহাস বহু লক্ষ বছরের। এই যাত্রাপথে সে তার ফুট প্রিন্টস, মানে পদচিহ্ন রেখে গেছে। সেগুলোই হচ্ছে ফসিল। মাছ কিংবা

তাকে রাগাবার জন্য বলতাম, আমি কিন্তু ঈশ্বরের নয়, আমার বাবা-মায়ের ক্রোমোজোমের সৃষ্টি
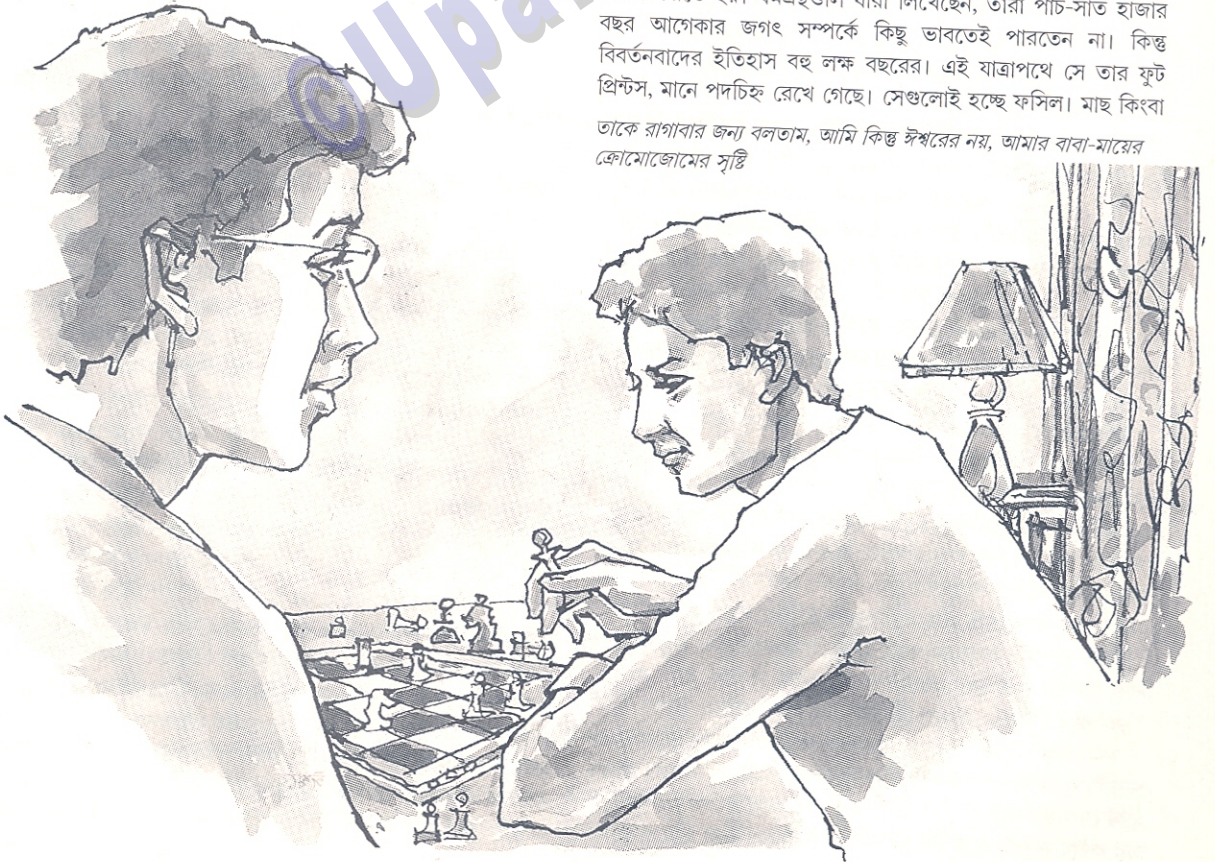
কত রকম প্রাণীর ফসিল, জন্তু-জানোয়ারের হাড়গোড়, প্রগৈতিহাসিক মানুষের শিরদাঁড়া, বিভিন্ন আকারের মাথার খুলি। তুই তো জানিস অতীশ! কারবন ফোরটিন টেস্টে সব কিছুরই বয়েস মাপা যায়। কোন ফসিলটা সাত লক্ষ বছর আগেকার, আর কোন হাড়গোড়গুলো দেড় লক্ষ বছরের তা জানতে ভুল হয় না। এর থেকেই ধাপে ধাপে বোঝা যায়, কী ভাবে বহুকাল ধরে আদিম প্রাণী থেকে আমরা আধুনিক কালের মানুষের অবস্থায় পৌঁছেছি। একালে ডিএনএ আর রক্তবাহিত জিনের আবিষ্কারে সেই প্রমাণ আরও দৃঢ় হয়েছে।

অতীশ কথা ঘোরাতে ওস্তাদ। ফস করে বলল, তুই যে তখন বললি, তোর বাবা যদি তোর মায়ের বদলে অন্য মহিলাকে কিংবা তোর মা অন্য পুরুষকে বিয়ে করতেন, সেটা আসলে সম্ভবই ছিল না। অনেক পাত্র-পাত্রী দেখাদেখি হয়, প্রেমের ক্ষেত্রেও এর সঙ্গে, তার সঙ্গে, তারপর যখন পেয়ার বন্ডিং হয়, অর্থাৎ বিয়ে করে কিংবা জোড় বাঁধে, তা আসলে প্রি-ডেসটিনড। ওই জন্যই ইংরিজিতে বলে, ম্যারেজেস আর মেড ইন হেভেন।

আমি চুপ করে গেলাম। এত দূর! জাত, কুল, ধর্ম, বর্ণ মেনে বিয়ে করার ব্যাপারটা আমার এমনই ন্যক্কারজনক লাগে যে, এ নিয়ে তর্ক করতেও ইচ্ছে করে না।

আমাকে খোঁচা মারার জন্য অতীশ আবার বলল, যারা জোর করে এই নিয়ম অগ্রাহ্য করতে চায়, তাদের জীবন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এই জন্যই তো বরুণার সঙ্গে তোর বিয়েটা টিঁকল না। তুই বামুন হয়ে কেন একটা শুদ্দুরের মেয়েকে বিয়ে করতে গেলি? মেয়েটা ভাল, তা অস্বীকার করছি না, কিন্তু ঠিক ম্যাচ হয়নি। এরকম বিয়ে কক্ষনও সুখের হতে পারে না।

আমি মৃদু গলায় বললাম, সব কিছু ঠিকঠাক মেনে বিয়ে হলেই কি সেইসব জীবন সুখের হয়? রবীন্দ্রনাথ তো সব দিক দেখেশুনেই তাঁর মেয়েদের বিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর সব কটা জামাই অপদার্থ হয়েছিল। আমার মা-ও সারা জীবন নিজেকে বঞ্চিত মনে করেছেন।

অতীশ দুর্বলভাবে বলল, রবীন্দ্রনাথের সব কটা জামাই অপদার্থ ছিলেন কি না, আমি ঠিক জানি না। হয়তো অমন দোর্দাণ্ডপ্রতাপ শ্বশুরের ব্যক্তিত্বের চাপে তারা কাবু হয়ে গিয়েছিল, পরে বিদ্রোহ করেছিল। সেই কথা, ব্রাহ্মণদের বংশের ধারা...

হঠাৎ সে চুপ করে গেল। বোধহয় তার মনে পড়ে গেল যে রবীন্দ্রনাথ নির্বংশ হয়ে গেছেন।

দাবা খেলার ফাঁকে ফাঁকে নীলাঞ্জনা আসে। মেয়েকে বাবার কোলে বসিয়ে দেয়। অভি এসে ছোটাছুটি করে যায়। অভি এই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই কিছু না কিছু ভাঙার শব্দ হবেই। কত কিছু যে ভাঙে সে তার ঠিক নেই।

এক একবার সে বাবার কোলে ছোট বোনকে দেখে নিজেও জোর করে সেখানে বসলে চায়, কিন্তু বেশিক্ষণ বসে না, একটু পরেই ছটফটিয়ে উঠে যায়।

নীলাঞ্জনা তাকে বলে, অভি, আয়, একবার আমার কোলে বসবি না?

বাচ্চারা তো ভদ্রতা কিংবা মন-রাখা কথার ধার ধারে না। সে সরাসরি বলে দিল, নাঃ, এখন না!

অভির বয়েস তখন পাঁচ বছরের কয়েক মাস বেশি। মাথা ভর্তি চুল, মুখখানাই দুষ্টুমিতে ভরা। হাফ প্যান্ট ও ছবি-আঁকা গেঞ্জি পরা। তাকে বয়েসের তুলনাতেও বড় দেখায়।

নীলাঞ্জনা বলে, অভি আমার চেয়েও ওর বাবাকে বেশি ভালবাসে!

অভি ততক্ষণে জানলার কাছে ছুটে গিয়ে বাইরের একটা কুকুরের দিকে ভৌ ভৌ করে ডেকে ওঠে।

তা শুনে কেঁদে ওঠে অপরাজিতা।

যখন ওরা কেউ ঘরে থাকে না, তখন অতীশ আবার পুরনো কথার জের টানে। দাবা খেলার সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা কিংবা তর্ক-বিতর্ক আমি যে পছন্দ করি তা নয়, অতীশেরই এই ঝোঁকটা দিন দিন বাড়ছে। তার কথায় ক্রমশই ফুটে উঠছে হিন্দুত্বের ঝাঁঝালো গন্ধ। হয়তো চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর ও ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেবে। বেশ কয়েকজন নাম করা আইএএস অফিসার তো তেমনই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

অতীশ বলল, ব্রাহ্মণেরা এ-দেশে জ্ঞানে, গুণে, বিদ্যাচর্চায় যে বিশেষ ধারা সৃষ্টি করেছে, পৃথিবীতে তার তুলনা পাবি না। সেইজন্যই ব্রাহ্মণদের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা দরকার। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে যদি মিলন হয়, তা হলে সেই গর্ভজাত সন্তান সমাজে নিজের স্থান করে নিতে পারে না। তারা অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে।

আমি চাপা বিদ্রূপের সুরে বলি, এসব ভাবনা কবে থেকে চালু হল বলতো? মহাভারতে পড়েছি, বেদব্যাস ঋষি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাই না? তিনি আসলে ব্রাহ্মণ পরাশর আর এক জেলের মেয়ের মিলনের বেজন্মা! তারপর তিনি এক সময় দুই ক্ষত্রিয় রানির সঙ্গে মিলিত হলেন। ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু নামে দুটি সন্তান জন্মালো, একজন জন্মান্ধ, আর একজনের জন্ম থেকেই চর্মরোগ। এই দুজনের বিদ্যা-বুদ্ধি জ্ঞানের তেমন খ্যাতি ছিল, এমন জানা যায় না। কিন্তু বেদব্যাসের আর একটি যে শূদ্রাণীর সঙ্গে মিলন হয়েছিল, সেই পুত্রটির নাম বিদুর, সে কিন্তু জ্ঞানে, গুণে, ধার্মিকতায় বিশিষ্ট হয়ে ছিল।

অতীশ বলল, মহাভারতের ওসব গল্প আক্ষরিক অর্থে ধরতে নেই। সবটাই রূপক। বিদুর বলে আসলে কেউ ছিলই না। তুই রক্তের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস করিস না, অংশু? তুই নিজে...।

এবার ধৈর্য হারিয়ে আমি চিৎকার করে বললাম, নাঃ! কী সব বাজে কথা বলছিস! এই রক্তের বিশুদ্ধতার কথা তুলে মানুষের সভ্যতার কত ক্ষতি হয়েছে, তুই জানিস না? এ দেশের বামুনরা এই বিশুদ্ধতার ধুয়ো তুলে কয়েকটা সেঞ্চুরি আমাদের নষ্ট করে দিয়েছে। জাত-পাতের বিচার, অস্পৃশ্যতা, এ সবই তো এদেশের মানুষদের পতনের কারণ।

অতীশও কঠোরভাবে বলল, ব্রাহ্মণরা এ দেশের ক্ষতি করেছে? তুই কি বলছিস অংশু? জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিদ্যা ও সংস্কৃতিচর্চা, সবই তো ব্রাহ্মণদের।

আমি বললাম, সব বাজে কথা। বাই দা ওয়ে, আমি নিজেকে ব্রাহ্মণ মনে করি না। সেন রাজাদের আমলে অনেক অন্য জাতের মানুষও টাকা দিয়ে নিজেদের ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় করেছিল। নইলে, বাংলায় এত ব্রাহ্মণ এল কী করে! তোর হিটলারের কথা মনে নেই? সে লোকটাও রক্তের বিশুদ্ধতার ধুয়ো তুলেছিল না? আর্য রক্ত ছাড়া আর সব কিছুই বরবাদ। জার্মানদের সঙ্গে কোনও ইহুদির বিয়ে নিষিদ্ধ করেছিল। কয়েক কোটি ইহুদিকে খুন করে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল একেবারে! তোর মতন অনেক সভ্য, ভদ্র, শিক্ষিত জার্মান তা বিশ্বাসও করেছিল।

অতীশ বলল, হিটলারের সঙ্গে তুলনা করাটা তোর ঠিক হল না। ও লোকটা পাগল ছিল। আমরা তো কারওকে মেরে ফেলার কথা বলি না। দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার কথাও বলি না। সব জার্মান হিটলারের কথা বিশ্বাস করেনি, অনেকেই ইহুদি নিধনের কথা জানত না।

আমি বললাম, সবাই বিশ্বাস করেনি, অনেকে করেছে। প্রতিবাদ না করে মেনে নিয়েছে। টাকাপয়সার জোর থাকলে, রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন থাকলে, কোনও ভ্রান্তি এবং ক্ষতিকর আদর্শও যে একটা দেশের সমাজের ক্ষতি করতে পারে, উনিশশো তিরিশের দশকের জার্মানিই তার প্রমাণ। এখন আমেরিকার কিছু কিছু ধর্মীয় সংস্থান, যাদের তহবিলে আছে প্রচুর টাকা, যারা তাদের মনোনীত প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের টাকা দিয়ে সাহায্য করে, তারাই এখন ডারউইন তত্ত্বের বিরোধিতা করছে। আগে ছিল ক্রিয়েশানইজমের তত্ত্ব। অর্থাৎ সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি। এখন কিছুটা চালাক হয়ে বলছেন, ইনটেলিজেন্ট ডিজাইন। অর্থাৎ কিছু কিছু অর্গানিজমের গঠন এমনই সূক্ষ্ম, যে বিবর্তনবাদ দিয়ে তা সহজবোধ্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। অমনি ওরা বলছে, ওই তো ইনটেলিজেন্ট ডিজাইন, এর পেছনে আছে মহা বুদ্ধিমান ও শক্তিমান কেউ, অর্থাৎ ঈশ্বর। ইস্কুলে এসব পড়িয়ে ছেলে-মেয়েদের মাথা খাওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ আবার বাইবেল তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ছবি-টবিতে দেখিস না, অ্যাডাম আর ইভ কী রকম ফর্সা?

যদিও ওরা আরবদেশীয় হবারই কথা। অর্থাৎ আবার নতুন করে আমেরিকান ছেলে-মেয়েদের মাথায় ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে যে, ওই শ্বেতাঙ্গ দম্পতির থেকেই মানুষের বংশবিস্তার হয়েছে। তার মানে, আফ্রিকার কালো মানুষ কিংবা আমরা সবাই এলেবেলে। অথচ, পৃথিবীর প্রথম মানবী, মানুষের আদি জননী যে মধ্যআফ্রিকার একটি কালো মেয়ে, বিজ্ঞান তা নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠা করেছে। তারপর মানুষ যেখানে যেমন ছড়িয়ে পড়ছে, সেইসব জায়গার আবহাওয়া, পরিবেশ কিংবা খাদ্য অভ্যেসের ওপর তাদের চেহারা ও গায়ের রং বদলেছে।

অতীশ বলল, তবে যে তুই ইভলিউশানের স্বপক্ষে মানুষের জিনের কথা বলেছিলি? তার মানেই তো রক্তধারা।

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, ওটা অতি সরলীকরণ। পরিবেশ অনুযায়ী মানিয়ে নেওয়া, ডারউইন যাকে বলেছেন ন্যাচারাল সিলেকশান, তার সঙ্গে বহু লক্ষ বছর ধরে মিউটেশান, জেনেটিক ড্রিফট এগুলো বাংলায় কী করে বলব জানি না, তার সঙ্গে জিনের প্রবাহ, এই সব মিলিয়েই পরিবর্তন আসে। মোট কথা, ন্যাচারাল সিলেকশানই বিবর্তনের মূল কথা, রক্তটক্তের শুদ্ধতা অত্যন্ত বাজে উদ্দেশ্যমূলক প্রচার।

অতীশ বলল, আমাদের ব্রাহ্মণদের গোত্র আছে জানিস তো? শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, অর্থাৎ আমরা সবাই ওইসব মুনিদের বংশধর। হাজার হাজার বছর ধরে।

আমি বললাম, ক' হাজার? বিবর্তনের ধারায় হাজার টাজারের কোনও প্রশ্নই নেই, লক্ষ, কোটি বছরের ব্যাপার।

অতীশ বলল, সে যাইই হোক, এই রক্তের ধারার জন্যই ব্রাহ্মণের সন্তান, পৃথিবীর যেখানেই থাকুক, আফ্রিকা কিংবা নিউগিনিতে, তার মধ্যে পূর্বপুরুষের সব গুণাবলি ফুটে উঠবেই। কাকের বাসায় কোকিলের ছানা বড় হলেও সে কাক হয় না, কোকিলই থাকে, এখানে তোর পরিবেশতত্ত্ব খাটল কোথায়?

আমি বললাম, ছোট করে ভাবলেই এই রায় ভুল হয়। মুনি, ঋষি আর সব ধর্মের শাস্ত্রনায়কদের কল্পনার দৌড়ও এরকম ছোট ছিল। মাধ্যাকর্ষণ আর বিবর্তনবাদ বিজ্ঞানের দুটি যুগান্তকারী আবিষ্কার, তোর মুনি-ঋষিরা এসব বুঝতেন না।

অতীশ ধমক দিয়ে বলল, আবার বাজে কথা বলছিস? যুক্তি কোথায় গেল?

আমি বললাম, যুক্তিটা হচ্ছে এই, কাকের বাসায় কোকিলের ছানা থাকে, যদি এমন হয়, কাকেরা সেই ছানাটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেল, যেখানে শুধুই কাক, একটাও কোকিল নেই, তাহলে সেই ছানাটাও বড় হয়ে কা কা করেই ডাকবে, তার গলায় কুহু কুহু বেরুবে না। কোনও বামুনের ছেলেকে যদি জন্মের পরেই আন্দামানের আদিবাসীদের মধ্যে জঙ্গলে রেখে আসা হয়, যেখানে কোনও সভ্য মানুষের সঙ্গে তার দেখা হবে না, শিক্ষা-দীক্ষার কোনও সুযোগ থাকবে না, তা হলে নিশ্চিত সে অন্য আর পাঁচজন আদিবাসী ছেলের মতনই বর্ধিত হবে। তার মধ্যে ব্রাহ্মণের চারিত্রলক্ষণ ফুটে ওঠা নিতান্তই কবি-কল্পনা। সেই রকম ওখানকার কোনও আদিবাসী ছেলেকে খুব শিশু অবস্থায় আনা যায় কোনও শিক্ষিত পরিবারে, অন্যান্য ছেলেদের মতন পাঠানো যায় ইস্কুলে, তা হলে সেও ক্রিকেট খেলা শিখতে পারে, তীর-ধনুক চালিয়ে শিকার শিখবে না।

অতীশ হঠাৎ চুপ করে গেল।

আমি মন দিলাম খেলায়।

অতীশ ওর রাজাকে সরিয়ে ভুল করেছে। তিন দিকে আমার বোড়ে। আমি বললাম, এবার তো তুই মাত হয়ে যাবি রে? আর কি চাল দিবি?

অতীশ অন্যমনস্কভাবে বলল, হুঁ।

তারপর ফিক করে একটু হাসল।

তখনই আমার সন্দেহ হল, এই যে দিনের পর দিন বিবর্তনবাদটাদ নিয়ে কচকচি, আমাকে খুঁচিয়ে তোলা, রাগানো, এর নিশ্চয়ই অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে। বুদ্ধিমান, শিক্ষিত মানুষ, এসব কি সে একেবারে বোঝে না বা জানে না? কিংবা আমার মুখ দিয়েই শুনতে চায়?

ওর মনের মধ্যে একটা দোলাচল চলছে। নতুন করে আঁকড়ে ধরেছে ধর্মকে, মনের মধ্যে গেঁথে গেছে অনেক সংস্কার, রক্তের ধারাটারা সেই সংস্কারেরই অন্তর্গত। আবার যে-ছেলেটিকে সে দত্তক নিয়েছে সে অজ্ঞাতকুলশীল, তার রক্তের কোনও ঠিক নেই, অতি দরিদ্র কোনও কামিনের সন্তান হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ তারা গর্ভপাতের খরচও জোটাতে পারে না। হতে পারে কোনও ধর্ষণের ফসল।

অতীশ তাকে অতিরিক্ত স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছে। নিজের মেয়ের সঙ্গে একটুও তফাত করেনি। তবু সম্ভবত তার মনে আশঙ্কা আছে, বড় হয়ে এ ছেলে কী মূর্তি ধরবে? ধর্মীয় দুর্বলতার জন্য সে নিজে এই আশঙ্কা দূর করতে পারছে না, আবার আমার মুখে এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা শুনে আশ্বস্ত হতে চায়?

বাইরে শোনা যাচ্ছে অভির রিনরিনে গলা। কাকে যেন সে বলছে, তার সঙ্গে বল খেলতে।

তার পরই বাগানের মালি চেঁচিয়ে উঠল, এই, এই, দিল, দিল সব দোপাটি গাছগুলো শেষ করে। ও মাইজি দেখুন এসে।

নীলাঞ্জনা ওপরে বারান্দা থেকে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

মানি বলল, খোকাবাবু বাগানে কাঁচা মাটিতে দৌড়োচ্ছে। সবে ফুল এসেছে, এরকম করলে কি বাগান থাকে?

নীলাঞ্জনা বলল, ঠিক আছে, একটুখানি বেড়া দিয়ে নাও না কেন? ও-ই বা খেলবে কোথায়? অভি, এসো, ওপরে এসো, দুধ খাবে।

অভি বলল, না, এখন যাব না। দুধ খাব না। আমি খেলছি!

অতীশ দাবার বোর্ড ছেড়ে জানলার কাছে দাঁড়াল। তাকে দেখে অভি বলে উঠল, দ্যাখো না, বাবা, আমাকে কেউ বল দিচ্ছে না!

অতীশ বলল, দাঁড়া, আমি আসছি, আমি খেলব তোর সঙ্গে।

তিন

বাঁকুড়া থেকেই অতীশ বদলি হয়ে এল কলকাতায়। কয়েকটা জেলায় রাজত্ব করার পর রাইটার্স বিল্ডিং-এ জয়েন্ট সেক্রেটারি।

ওদের পৈতৃক বাড়ি সোনারপুরে, সেখান থেকে প্রতিদিন যাতায়াতের অসুবিধে, জায়গা পেয়ে গেল দক্ষিণ কলকাতার আয়রন সাইড রোডের কোয়ার্টারে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিশাল বাংলোর তুলনায় এসব কোয়ার্টার কিছুই না।

এই বদলি হওয়াটা অতীশদের পক্ষে খুবই সুসময় বলতে হবে। ছেলে-মেয়েরা ভর্তি হতে পারবে কলকাতার ভাল স্কুলে। তাছাড়া বাঁকুড়াতে খানিকটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ডি এম-রা যখন এক জেলা থেকে অন্য জেলায় পোস্টিং পান, তখন দু-একজন কাজের লোকও তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। যেমন অতীশদের হেড কুক ভীমের হাতের রান্না একেবারে অমৃত, অন্তত অতীশ তাই মনে করে। সেইজন্য সে ভীমদের কখনও ছাড়েনি। এই ভীম অভির জন্মবৃত্তান্ত জানে। বাঁকুড়া থেকে পুরুলিয়া দূরে নয়, সেখানকার অনেক খবরই পৌঁছে যায়, বাঁকুড়ার কোয়ার্টারের কাজের লোকেরা অভিকে নিয়ে কানাকানি করেছে আঁস্তাকুঁড়ের একটা বেজন্মা ছেলে সাহেব-মেমসাহেবের কাছে এত আদর-যত্নে আছে, এটা কাজের লোকদেরই ঠিক সহ্য হয় না। তাদের কাছে মনে হয়, এটা অনাচার। কারণে-অকারণে তারা অভির নামে নালিশ করত মনিবদের কাছে, একটু আড়াল পেলেই তারা খারাপ ব্যবহার করেছে অভির সঙ্গে—অতীশ আর নীলাঞ্জনা দুজনেই এটা বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু কাজের লোকদের সব সময় বকাবকি করা যায় না, সবসময় চোখে চোখেও রাখা যায় না। ভীমকে আর কলকাতার আনা হয়নি, সে ছুটি পেয়ে চলে গেছে বালেশ্বরে।

কয়েক দিনের মধ্যেই নীলাঞ্জনা আয়রন সাইড রোডের ফ্ল্যাট গুছিয়ে ফেলল এখানে অত কাজের লোকের সুবিধে নেই, নিজেকে অনেক কিছু করতে হবে। এই সময় তার শরীরটাও বেশ ভাল যাচ্ছে।

নীলাঞ্জনা ছিপছিপে তন্বী, রংটা একটু চাপা, ফর্সাও নয়, কৃষ্ণাও নয়, শ্যামা যাকে বলে। তার স্বাস্থ্যটা ডেলিকেট। যখন তার মনমেজাজ ভাল থাকে, বিশেষ কোনও সাজগোজ না করলেও তাকে ভারি সুন্দর দেখায়। অনেকটা যেন ইথিরিয়াল বিউটি। বেশি ইংরিজি এসে যাচ্ছে, কী করব ঠিক ঠিক বাংলা শব্দ মনে আসছে না। মুখটা ভাসা ভাসা, প্রায়ই মনে হয় সে যেন বাস্তব জগতে নেই। তবে মাঝে, কয়েক মাস অন্তর তার কী যে হয়, মুখটা বিষাদাচ্ছন্ন, কথা বলতেই চায় না, এক সময় তাকে শয্যা নিতে হয়। আবার কয়েক মাস পরে সে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে নতুন জীবন শুরু করে।

যখন মনে হয়েছিল, এই দম্পতির সন্তান সম্ভাবনা আর নেই, তখন নীলাঞ্জনা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তো। বর্গভীমার মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল একবার। অভিকে দত্তক নেবার পর তার আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে। নীলাঞ্জনাকে অমন চাঙ্গা অবস্থায় আমি আগে আর দেখিনি। বাচ্চার সব কিছু, এমনকি গু-মুত পরিষ্কার পর্যন্ত সে করত নিজের হাতে। তাকে ঘুম পাড়াতো গান শুনিয়ে।

অভির কারণেই যে নীলাঞ্জনার নিজের গর্ভে সন্তান আসে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। একটি শিশুকে সর্বক্ষণ আদর-যত্নে, স্নেহ-মমতায় ঘিরে থাকলে কোনও এক সময় সেই নারীর অবরুদ্ধ মাতৃত্ব মুক্ত হয়ে যেতে পারে। নানা রকম গ্ল্যান্ডের সিক্রিয়েশান হয়, ডাক্তারদের নিরিখও তুচ্ছ হয়ে যায়। এক সন্তান দত্তক নেবার পরেই কোনও কোনও রমণীর গর্ভবতী হয়ে পড়ার মতন ঘটনা অনেক ঘটেছে, এটা সম্পূর্ণ বায়োলজিক্যাল ব্যাপার, কিছুটা ইচ্ছাশক্তিরও হয়তো, কিন্তু অলৌকিকত্বের কিছু নেই।

মেয়ের জন্মের আগে যে নীলাঞ্জনার জীবনসংশয় হয়েছিল, তার কারণ অন্য। চার-পাঁচ মাসের অবস্থায় হঠাৎ ধরা পড়েছিল যে সে সাঙ্ঘাতিক রক্তাল্পতায় ভুগছে। তার ওপর তার জীবনরস খানিকটা শুষে নিচ্ছে তার গর্ভের ভ্রূণ। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মেয়েটি মাতৃঘাতিনী হয়নি। অভির মতন অপরাজিতা ছটফটে স্বভাবেরও নয়। আর অতীশ বা নীলাঞ্জনা কেউই ফর্সা না হলেও মেয়েটা হয়েছে গৌরবর্ণা। নীলাঞ্জনার মায়ের গাত্রবর্ণ নাকি ছিল অপ্সরাদের মতন। এটাই জিনের খেলা, কোথাও কোথাও এক-দু প্রজন্ম ডিঙিয়ে আসে। কোথায় যেন পড়েছিলাম, এ চাইল্ড মে বি বর্ন ইন হিজ (অর হার) গ্র্যান্ড মাদারস উম্ব!

ওরকম গায়ের রঙের জন্যই অপরাজিতার ডাক নাম পরি।

অতীশরা বাঁকুড়া ছেড়ে চলে আসার কয়েক মাস পরেই আমিও ওখানকার কলেজের চাকরি ছেড়ে দিই। পড়াতে আর আমার ভাল লাগছিল না। কলকাতায় এসে কিছুদিন আমি খবরের কাগজে কাজ করলাম, তাও ঠিক পোশাবে না, প্রতিদিন লেখালিখি করার যোগ্যতা আমার নেই। এখন এক বন্ধু একটা গবেষণা সংস্থায় কাজ জুটিয়ে দিয়েছে, সেখানেও কতদিন টিঁকতে পারব জানি না। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আমার ভালই লাগে। নিজস্ব বাড়ি ঘর কিংবা ফ্ল্যাটও নেই, জার্মানি-প্রবাসী এক বন্ধু সল্ট লেকে একটা ফ্ল্যাট কিনে রেখেছে, বছরে মাত্র তিন সপ্তাহের জন্য আসে, আপাতত সেটাই ব্যবহার করছি। অর্থাৎ আমি কেয়ারটেকার, তাই ভাড়া দিতে হয় না।

অতীশদের কোয়ার্টারে যাই মাঝে মাঝে। ওদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আমার তেমন ভাব হয়নি। বাচ্চাদের সঙ্গে আমি ঠিক সহজ ভাবে মিশতে পারি না। তাদের কোলে বসিয়ে আদর করা কিংবা গাল টিপে দেওয়া আমার ধাতে নেই। আমাকে ওরা পছন্দ করছে কি না এই ভেবেই সন্তর্পণে থাকি। তবে, ও দুটিতে কীরকম ভাবে বেড়ে উঠছে, দু জনের স্বভাব-চরিত্রের তেমন তফাত হয় কি না, তা জানার আমার খুবই কৌতূহল আছে। তাই অলক্ষ্যে থেকে আমি দুজনকেই লক্ষ করি।

ছোট বোনটি বাড়িতে আসার পর প্রথম প্রথম অভি তার ধারে কাছেই আসতে চাইতো না। যেন বুঝতেই পারতো না, ওইটুকু একটা প্রাণী কী করে এল! তারপর তার বাপ-মায়ের স্নেহে ভাগ বসাচ্ছে দেখে সে হিংসুটেপনা করল কিছুদিন। দু' জনের সাড়ে তিন বছরের বয়েসের তফাৎ। অভি এখন সদ্য ছ' বছর পেরিয়েছে। এতদিন নাকি সে তার কোনও খেলনায় পরিকে হাত দিতেই দিত না, এখন নাকি একটু একটু দিচ্ছে। কিন্তু অভি আর একটু বড় হলেই খেলার সঙ্গী অন্য ছেলেদের পেয়ে যাবে, তখন ছোট বোনের সঙ্গে তার ব্যবহার কী রকম হবে, সেটাই দেখার বিষয়!

একদিন সন্ধেবেলা ওদের বাড়িতে বসে চা খাচ্ছি, অতীশ বাড়ি ফেরেনি, গল্প হচ্ছে নীলাঞ্জনার সঙ্গে। বেশি বয়েসে সন্তান হলে বাবা-মায়েরা অন্যদের কাছে প্রায় সর্বক্ষণ ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কেই কথা বলে, এটা বাঙালি, অবাঙালি, সাহেব-মেম, সময়ের একই রকম স্বভাব। এখানেও রসের প্রশ্ন আছে। নিজের ছেলে-মেয়ের নানা রকম দুষ্টুমি বা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, এসব নিত্য দেখেশুনে বাবা-মায়েরা পুলকিত হতে পারে, কিন্তু অন্যদের কেন তা বার বার শুনতে ভাল লাগবে? এসব শুনতে শুনতে অতিথিরা এক সময় গোপনে হাই তোলে, তারপর বলে, এবার চলি ভাই।

আমার কিন্তু খারাপ লাগে না। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব শুনি। অতীশ আর নীলাঞ্জনা হয়তো ভাবে, ওদের ছেলেমেয়েদের আমি ভালবাসি। ঠিক তা নয়। এটা যেন আমার গবেষণা : রক্তের ধারা বনাম পরিবেশ, এর মধ্যে আমি যে পরিবেশের প্রভাবের পক্ষপাতী। ওর ছেলের ওপর সেই প্রভাব কতখানি পড়ে, সেটাই তো পরিবেশ।

নাগালের অনেক উঁচুতে দরজার ছিটকিনি খুলে ফেলার কত রকম উদ্ভাবনী শক্তি অভির, সেই গল্প করছিল নীলাঞ্জনা। হঠাৎ থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, অংশুদা, তুমি আর বিয়ে করবে না? তোমার নিজের ছেলে-মেয়ে হোক, তুমি তা চাও না?

সহসা উত্তর দেওয়া সম্ভব হল না আমার পক্ষে।

বরুণার সঙ্গে আমার বিবাহবিচ্ছেদের পর জীবনটা সরল হবার বদলে বরং আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

আমাদের দুজনের ভালবাসার সম্পর্কের মধ্যে কোনও খাদ ছিল না। বরুণা যখন ইংরেজিতে এম এ পড়ছে, আমি তখন পিএইচডি করছি অর্থনীতিতে। পরিচয় হবার পর, পরস্পর আকৃষ্ট হয়ে, নিজেদের অনেক রকমভাবে যাচাই করে নিয়ে, দুজনেরই পারিবারিক সম্মতি বা আপত্তির তোয়াক্কা না করে বিয়ে করেছিলাম আমরা।

পিএইচডি শেষ না করেই আমাকে চাকরি নিতে হল। এক বছরের মধ্যে বরুণাও কাজ পেয়ে গেল বাঁকুড়ার একটা ভাল স্কুলে। অতীশরা তখনও ওখানে আসেনি।

বরুণার সঙ্গে আমার ভালবাসা ছাড়াও রুচির খুব মিল ছিল। ও খুব একটা সংসারী ছিল না, টাকা-পয়সা নিয়ে মাথা ঘামাতো না। শরীরে ব্যাপারটা খুব পছন্দ করত, আবার রাত্তিরবেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেগে গল্প করতেও ওর ক্লান্তি ছিল না।

গভীর রাতে, সমস্ত বাঁকুড়া যখন ঘুমন্ত, আমরা দুজনে উলঙ্গ অবস্থায় ছাদে বসে চাঁদের আলো গায়ে মাখতাম। মধুযামিনী যাকে বলে! বরুণা মুখস্থ শোনাতো প্রচুর ইংরিজি কবিতা।

তবু বিয়েটা অকস্মাৎ ভেঙে গেল কেন?

নিজের থেকে খানিকটা দূরত্ব সৃষ্টি করে আমি নির্লিপ্তভাবে ভেবে দেখার চেষ্টা করে বুঝেছি, দোষটা আমারই।

সেই সময় আমার খুব সত্যি কথা বলার ঝোঁক ছিল। সত্য সব সময়ে অবশ্যই ভাল, কিন্তু তা নিয়ে বড়াই করাও ঠিক নয়। যতদূর সম্ভব মিথ্যে কথা না বলাই উচিত, তবে অযাচিতভাবে সব কিছু প্রকাশ না করে কিছু কিছু ব্যাপার গোপন রাখাই যুক্তিসঙ্গত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও কিছু কিছু গোপনীয়তা থাকে, নইলে একঘেয়েমি এসে যেতে পারে। আমি সেই সময় তা বুঝিনি।

শহরের এক প্রান্তে আমরা একটা ছোট্ট বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম। দুটি মাত্র ঘর ও একটি বারান্দা, উপরি পাওনা হিসেবে একটা দেয়াল ঘেরা বাগান। তার সামনে গেট। আমাদের পক্ষে আদর্শ।

কলেজের চাকরিতে মাইনে কম ছিল। ছুটি বেশি। উপার্জন বাড়াবার

A FRUITFUL TRADITION

ver the years, PFC - a leading financial institution catering to the power sector has tered the art of achieving targets by pooling its resources and reinforcing its efforts.

ANCE HIGHLIGHTS (2004-05)

e Sanctions	More than Rs.743billion
e Disbursement	More than Rs.500 billion
	Rs. 9.83 billion
Rate	99% (Nil NPAs)
Productivity	
ment per employee	Rs. 345 million
t per employee	Rs. 36 million

ACCOLADES

- Rated 'Excellent' consistently since the first year of signing an MoU with Govt. of India (1993-94).
- Awarded 'MOU award of Excellence' four times for being in the 'Top 10 Public Sector Undertakings of the country'.
- Accorded the Miniratna Category - I status.
- Highest safety ratings from domestic and international credit rating agencies.
- ISO 9001:2000 Certification for the Project Appraisal System.

FUTURE PLANS

- Aims to capture a share of 20-25% of the total investment to be made in the Power Sector during the Xth and XIth Plan period.
- To consolidate and expand present business.
- To introduce new financial initiatives such as Equity Participation and Merchant Banking.
- Aspiring to be a Rs. 500 billion company by the year 2012.

POWER FINANCE CORPORATION LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
Chandra Lok, 36, Janpath, New Delhi-110001 INDIA
Tel. : (91) (11) 23722301 to 08, Fax : (91) (11) 23315822
Website: www.pfcindia.com

Financial Power behind Electric Power

PRESSMAN

জন্য আমি বাড়িতে কয়েকটি ছেলেমেয়েকে পড়াতাম। কখনও এক গাদা ছাত্র-ছাত্রী নিতাম না। তিনটির বেশি কিছুতেই না। প্রাইভেট টিউটর যদি মাইনে বেশি নেয় আর ছাত্র-ছাত্রীকে প্রত্যাখান করে, তবে সেই শিক্ষকের মান বাড়ে। সেই হিসেবে আমারও নাম ও মান বেড়েছিল।

সেই সামান্য ঘটনাটা ঘটল একদিন বিকেলবেলা। আমার চোখে সামান্য। বরুণার চোখে নয়।

দুটি ছাত্র ও একটি ছাত্রী, অর্থনীতির মতন নীরস বিষয় পড়াতে হয় দু'ঘণ্টা ধরে। সেটা শেষ দিন। গরমের ছুটিতে এই তিনজনই হস্টেল ছেড়ে যে-যার দেশের বাড়িতে চলে যাবে। তার পরেই পরীক্ষা। এই ব্যাচ আর আমার কাছে আসবে না।

ছেলে দুটিকে বাস ধরতে হবে বলে ওরা আগে চলে গেল। মেয়েটি আরও একটা প্রশ্নের উত্তর লিখিয়ে নিতে চায়। বছর উনিশেক বয়েস, ফুটফুটে চেহারার মেয়েটি, কারণে-অকারণে হাসে। হাসিতে যে মানুষের মুখখানা অনেক সুন্দর হয়ে যায়, তা অনেক মানুষই মনে রাখে না।

মেয়েটি কাল চলে যাবে। সম্ভবত ওর সঙ্গে আমার আর কোনওদিনই দেখা হবে না। ও খাতায় লিখছে এক মনে, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল, এমন চুল বিশেষ দেখা যায় না। হঠাৎ আমার ইচ্ছে হল, ওকে একটু আদর করি। কেন ইচ্ছে হল, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। ইচ্ছে হল ঠিকই। এর আগেও দু-এক দিন ও আমার কাছে একা থেকেছে, তখন এমন ইচ্ছে হয়নি, ছাত্রীদের আদর টাদর করা যে বিপজ্জনক, তা কি আমি জানি না? হয়তো শেষদিন বলেই ... তাও কোনওরকম ব্যভিচার, বেশি বেশি শরীর ছোঁয়াছুঁয়ি। এসবও মনে আসেনি।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম। পল্লবী, তুমি কি মাথায় কোনও গন্ধতেল মাখ?

মুখ তুলে, মাথা ঝাঁকিয়ে ও বলল, মোটেই না। অ্যাঃ, তেল আবার কেউ মাখে নাকি! আমি রোজ শ্যাম্পু করি। নইলে চুল আঁচড়াতেই পারি না।

আমি বললাম, তোমার চুলে খুব সুন্দর গন্ধ আছে।

পল্লবী বলল, গন্ধ আবার কী থাকবে? আমি তো পারফিউমও ব্যবহার করি না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, একটু তোমার চুল শুঁকে দেখব?

আমাদের দু'জনের চেয়ারের মধ্যে খানিকটা দূরত্ব আছে। আমাকে উঠতে হল না। পল্লবীই সাবলীলভাবে এসে বলল, দেখুন না।

ও মাথাটা ঝুঁকিয়ে আনল, আমি ওর কাঁধে হাত দিয়ে চুলে নাক ডোবালাম।

বরুণা বাড়িতে ছিল না। ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল। ঘর থেকেই বাগানের গেটটা দেখা যায়, বরুণা ফিরে আসছে। আমার চট করে সরে যাওয়া, পল্লবীর আবার নিজের চেয়ারে গিয়ে বসা, এর সময় ছিল। কিন্তু আমি পল্লবীর কাঁধ ধরে ঘ্রাণ নিতে নিতে বললাম, তুমি নিজেই জানো না, তোমার মাথায় কী সুন্দর গন্ধ!

কেন এরকম করলাম? ওওযে সত্যনিষ্ঠার বাড়াবাড়ি। আমি মেয়েটিকে চুমু খাইনি, বুকে হাত দিইনি। শুধু একটু চুলের ঘ্রাণ নিয়েছি, এটা লুকোবার কী আছে?

বরুণা দরজার কাছে এসে দৃশ্যটা দেখল। একটা কালো ছায়া পড়ল সেই মুখে।

আমি মুখ তুলে বললাম, কী, তোমার আজ ফিরতে দেরি হল?

উত্তর না দিয়ে বরুণা চলে গেল পাশের ঘরে।

পল্লবী চলে যাবার পর বরুণা অনেকক্ষণ সময় কাটাল বাথরুমে। আমার সঙ্গে কথা বলতেই চায় না।

একসময় ওর হাত ধরে জিজ্ঞেস করলাম, শোনো, তুমি কী দেখেছ, আর কী ভেবেছ জানি না। আমি কিন্তু মেয়েটির সঙ্গে কোনও অসভ্যতা করিনি।

বরুণা ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, কী করছিলে তাহলে?

ওর চুলের গন্ধ শুঁকে দেখছিলাম।

কেন?

কেন। মানে, ওরকম কোঁকড়া চুল আগে দেখিনি, মনে হল এই রকম চুলে বোধহয় কিছু একটা গন্ধ থাকে।

আমি বাড়ি না থাকলে বুঝি তুমি এইরকম পরীক্ষা করো?

এই হিংশুটিপনা করো না। আমি মোটেই লুকিয়ে চুরিয়ে এসব কিছু করি না।

ওকে কাছে টেনে আদর করার চেষ্টা করলাম। ও শক্ত হয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, লুকিয়ে চুরিয়ে করো না। আমাকে দেখিয়েই করতে চাও!

আমি বললাম, একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তুমি এত রাগ করছ কেন? তুমি মাঝে মাঝে ভুলে যাও যে তুমি বিবাহিত!

কী মুশকিল। বিবাহিত হলেই কি পৃথিবীর আর কোনও মেয়েকে কখনও একটু ছোঁয়াও যাবে না? একটু ইয়ার্কি, ঠাট্টা, একটু আদর, এতে দোষের কী আছে? তুমি যে বিদ্যুতের সঙ্গে শুশুনিয়া পাহাড় দেখতে গেলে, আমি আপত্তি করেছি?

কী? তুমি এই কথা বললে? বিদ্যুতের সঙ্গে আমি একলা গেছি? সঙ্গে আরও চারজন ছিল এক গাড়িতে।

চারজন কিংবা দশজন যাই থাকুক, তারা কেউ আমাদের তেমন চেনা নয়। ওখানে বিদ্যুৎই আমাদের একমাত্র বন্ধু!

তুমি বলতে চাও, আমি বিদ্যুতের সঙ্গে কিছু করেছি?

বরুণা, কিছু করা মানে কী? না, কিছু করওনি। কিন্তু অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য ঘনিষ্ঠতা, তারও তো একটা স্বাদ আছে। স্বামী বা স্ত্রী, দু'জনের পক্ষেই এটা—

বরুণা জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি অদ্ভুত!

আমি এই কথাটার মানে বুঝতে পারলাম না। আমার ধারণা, আমি স্বাভাবিক মানুষ।

একটু পরে বরুণা আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি এর পরেও অন্য মেয়েদের সঙ্গে এরকম চালিয়ে যাবে?

আমি এবার একটু কঠোরভাবে বললাম, তুমি বারণ করলে আর কাউকে ছোঁব না। তবে মনের মধ্যে কখনও যে এরকম ইচ্ছে হবে না, তা বলতে পারছি না। ইচ্ছেটা দমন করব!

আমার এই শেষ কথাটাতেই নাকি বরুণা সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছিল।

পরদিনই সে একা চলে গেল কলকাতায়। জেদি মেয়ে, আমার অনুরোধ, উপরোধ, ক্ষমা চাওয়া, কিছুই মানল না সে।

এরপর শুরু হল পত্রবিনিময়। আমি ওকে অন্তত পঁচিশখানা চিঠি লিখেছি। বরুণাও উত্তর দিয়েছে। সব চিঠিতে প্রায় একই কথা বারবার। শেষ চিঠিতে খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ করেই আমি লিখলাম—বরুণা, আমরা দু'জনেই যথেষ্ট লেখাপড়া করেছি। পৃথিবীর কত বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করি। সেসব ভুলে শুধু সামান্য একটা অন্য মেয়েকে একটু ছুঁয়ে দেখা নিয়ে আমরা এত সময় নষ্ট করছি! তুমি বুঝতে পার না, আমি তোমাকে কত ভালোবাসি? একশো ভাগ ভালোবাসি। আমি তোমাকেই চাই। তুমি ফিরে এস। কিংবা আমি কলকাতায় গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব?

এর উত্তরে বরুণা লিখল, আমি তোমার এই ভালোবাসা বুঝতে পারছি না। মনের মধ্যে সাড়া পাই না। তুমি আমাকে ভালোবাসবে, আবার অন্য মেয়েদেরও আদর করবে ... না, না, অংশু, আমি তোমার সঙ্গে আর থাকতে চাই না। ডিভোর্স করাই দু'জনের পক্ষে ভালো হবে।

এর পরেও বরুণাকে আমি অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি। বরুণা আর কিছুতেই মানতে চায়নি। ওর মূল আপত্তি নীতিগত, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা।

ডিভোর্স হয়ে গেল। অনেকেই খুব অবাক হয়েছিল, তারা কারণটা বুঝতে পারেনি। মূল কারণটা শুনলে অনেকেই হতবাক হয়ে যেত নিশ্চয়ই। অনেক দম্পতির মধ্যেই এর চেয়ে ঢের বড় বড় কারণে ফাটল ধরে, আবার জুড়েও যায়।

ডিভোর্স হল, কিন্তু আমাদের বিচ্ছেদ হল না।

বছর খানেক বাদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের রিডার ডক্টর সিরাজুল তারিখ হঠাৎ বাঁকুড়ায় চলে এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়, পণ্ডিত ও বিনয়ী মানুষ, চেহারাও সুন্দর, তাঁর ব্যবহারে খানদানি বংশের সহবৎ টের পাওয়া যায়। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে বিভিন্ন সেমিনারে। ঠিক বন্ধুত্ব না হলেও একটা পারস্পরিক ভালোবাসার সম্পর্ক আছে। তিনি যা বললেন, তা শুনে আমারই হতবাক হবার পালা।

সিরাজুল বরুণাকে বিয়ে করতে চান। তাঁর নিজেরও ডিভোর্স হয়ে গেছে চার বছর আগে। বরুণার বাপের বাড়ি বহরমপুরে। সিরাজুলও সেখানকারই মানুষ, ছোট বয়েস থেকেই চিনতেন বরুণাকে। অনেকদিন দেখা হয়নি, এখন আবার যোগাযোগ হবার পর দু'জনে দু'জনকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে। এই বিয়েতে কি আমার আপত্তি আছে?

আমি হাসব, না কাঁদব, বুঝতে পারিনি। আমি আপত্তি করার কে? বরুণার ওপর আমার তো আর কোনও অধিকারই নেই! আমার মতামত নিতে আসারই বা কী মানে হয়?

সিরাজুল বললেন, তিনি কোনও রকম টেনশান তৈরি করতে চান না। যদি মনে হয় অংশুমানের সঙ্গে বরুণার আবার মিল হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে, তা হলে তিনি স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়াবেন।

আমি বললাম, একবার ডিভোর্সের পরে আবার মিলন? এ তো সিনেমায় হয়। বরুণার সঙ্গে আমার আর কোনও যোগাযোগ থাকবে না। এটাই ডিভোর্সের অন্যতম শর্ত।

সিরাজুল বললেন, বরুণাও বলেছে, একবার আপনার মতটা জেনে নিতে।

আমি বললাম, গো অ্যাহেড! আমার সম্পূর্ণ মত আছে। বরুণা ভালো মেয়ে, ইউ উইল বি হ্যাপি। মাই কংগ্রাচুলেশান!

আমার কণ্ঠস্বরে কি একটু গোপন তিক্ততা ছিল? বরুণার এভাবে সিরাজুলকে পাঠানোয় আমি রীতিমতন অপমানিত বোধ করেছিলাম। জ্বালা করছিল বুকের মধ্যে। তবু কৃত্রিম হাসিমুখেই বিদায় দিয়েছিলাম সিরাজুলকে। তাকে আমার সত্যি মনোভাব জানাইনি। তখন থেকেই সত্যের প্রতি আমার ভক্তি-ভাব কমতে শুরু করেছে।

বিয়ে হয়ে গেল ওদের এবং দেড় বছরের মধ্যেই ওদের একটি পুত্রসন্তান জন্মাল।

আমি কলকাতায় ফিরে আসার পর সিরাজুলের সঙ্গে আমার দু-তিনবার দেখা হয়েছে, আমি শুকনো ভদ্রতা করে এড়িয়ে গেছি। বাড়িতে আমন্ত্রণ করেছেন, যাইনি। তবু একদিন ওদের দু'জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল একটা গানবাজনার আসরে। এ বেশ বড়লোকের বাড়ি, সঙ্গে প্রচুর পানাহারও আছে, মস্ত বড় বাগানে বসেছে পার্টি। গান-বাজনা আর পানাহারের মধ্যে কোনটা প্রধান বলা শক্ত।

বরুণাই প্রথম এগিয়ে এসে রাগ রাগ মুখ করে বলল, তুমি এর মধ্যেই ক'টা হুইস্কি খেয়েছ? চোখ লাল। আজকাল বেশি বেশি খাচ্ছ বুঝি?

আমি হাসলাম। অবান্তর প্রশ্ন। আমি কি প্রাক্তন স্ত্রীর বিরহে দেবদাস হয়ে যাব নাকি?

বরুণা আবার বলল, আমার বর তোমাকে কয়েকবার আমাদের বাড়িতে আসতে বলেছেন। তুমি আসনি কেন? হি ইজ আ রিয়েল জেন্টলম্যান। তোমাকে খুব পছন্দ করেন।

আমি বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ। যাওয়া হয়নি, মানে ব্যস্ত ছিলাম।

বরুণা বলল, কীসের ব্যস্ততা? কী করছ এখন? খবরের কাগজেও লেখা দেখি না।

এক এক জায়গায় অনেক ভিড়ের মধ্যেও নিরালা হওয়া যায়। এদিকে ওদিকে গুচ্ছ গুচ্ছ মানুষ, কেউ অপরকে লক্ষ করে না। সিরাজুল বসে আছেন গান বাজনার আসরে।

একটু এগিয়ে এসে, কণ্ঠস্বর বদলে বরুণা বলল, তুমি আর বিয়ে করবে না? বান্ধবী টান্ধবী হয়নি।

অলগাভাবে উত্তর দিলাম, হয়েছে কয়েকজন। এখনও বিয়ের কথা ভাবিনি।

বরুণা বলল, অংশু, তুমি আমার এ বিয়েতে মত দিলে কেন? বারণ করতে পারতে না?

আমি অনেকখানি ভুরু তুলে বললাম, কী পাগলের মতন কথা বলছ? তোমার বিয়েতে আমি বারণ করব কেন? তুমি একজনকে ভালোবেসেছ, সিরাজুল চমৎকার মানুষ, কেন, তুমি হ্যাপি হওনি?

অফ কোর্স আই অ্যাম হ্যাপি। কিন্তু তুমি তো আমায় আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলতে পারতে? তুমি তো জানোই, আমি কত ইমপালসিভ। আর কিছুদিন অপেক্ষা করলেই আমার ভুল ভেঙে যেত। তোমার মতন একজন রাস্কেলকেই তো আমি এখনও ... আমি এখনও।

বরুণা, চলো গান-বাজনার দিকে যাই। এখানে নাটক করা ঠিক হবে না।

তোমার জন্য আমার চোখে জল চলে আসছে, এটাকে কী বলে? কেন?

চোখ মুছে নাও প্লিজ। সিরাজুল কী ভাববেন!

কেউ কিছু দেখে না, তবে কোনও নারী এমন সমাবেশে কোনও পুরুষের সামনে চোখ মুছলে সবাই জেনে যাবে। তাই বরুণা চোখ মুছল না, চুপ করে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবেগ সংযত করল।

তারপর শান্ত, স্বাভাবিক গলায় বলল, তুমি আমার ছেলেকে একদিন দেখতে আসবে না? তোমার মুখের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে।

চার

দশ বছর বয়েস পর্যন্ত অভিকে নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। খুব ছোট

বাচ্চাদের দুরন্তপনা বেশ উপভোগ্য, কিন্তু একটু বড় হয়ে গেলে তার দস্যিপনা এক-এক সময় অসহ্য বোধ হয়।

তার জিনিসপত্র ভাঙার নেশাও বাড়ছে দিন দিন। আগে সে নিজের খেলনাপাতি কিংবা দুধের গেলাস ভাঙত। এখন সে ভাঙতে শুরু করেছে জানলার কাচ, আয়না। তার জন্য বাড়িতে এখন কোনও কিছুই যেন আস্ত রাখার উপায় নেই। একদিন আমি ওদের বাড়িতে থাকতে থাকতেই অভি হুটোপাটি করতে করতে এক ধাক্কায় টিভি-টা ভেঙে ফেলল। টিভি ভাঙলে যে এমন বিকট শব্দ হয়, আমার ধারণা ছিল না, ঠিক যেন একটা বোমা ফাটল, ছুটে এল অন্য ফ্ল্যাটের লোকজন।

সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে তাকে ভর্তি করে দিতে অসুবিধে হয়নি, কিন্তু পড়াশুনোয় তার মনোযোগ নেই একেবারেই। ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করে, প্রায়ই তার বাবা-মাকে নালিশ শুনতে হয়।

একদিন অতীশ আমাকে চিঠি দেখাল।

পরপর দু'বছর অভি ক্লাসে রেজাল্ট খুব খারাপ করেছে, কয়েকজন শিক্ষক অভিযোগ করেছেন যে, এ ছেলে একেবারেই কথাবার্তা শোনে না, হোমওয়ার্ক করে না। সেই জন্যই স্কুল কর্তৃপক্ষ অতীশকে জানিয়েছে যে এই ছাত্রটিকে ট্রান্সফার নিতে হবে, এই স্কুলে রাখা যাবে না।

অতীশ আমাকে বলল, দেখলি, তোর কথা মিলল না। এ ছেলের লেখাপড়া হবে না।

আমাকে দাবায় হারিয়ে অতীশ যেমন খুশি হয়, ওর গলাতে এখনও যেন সেরকম একটু খুশির ভাব। ছেলের এই অবস্থায় তার তো চিন্তিত, দুঃখিত হবার কথা। কিন্তু আমার তত্ত্ব প্রমাণ হওয়াটাই যেন বড় কথা।

আমি বললাম, তোমরা ভাই ওকে বড্ড বেশি আদর আর আস্কারা দাও! মাঝে মাঝে একটু শাসনও করা দরকার।

অতীশ বলল, ধ্যাত! আজকাল বাচ্চাদের মারধর করতে নেই একদম, তা জানিস না?

আমি বললাম, শাসন মানেই তো মারধর নয়। ভালোবাসা দিয়েও শেখানো যায় এ বয়েসে কোনটা করা উচিত আর কোনটা খারাপ কাজ। ছেলেবেলায় আমরা চাণক্য শ্লোকে পড়েছিলাম, সাত বছর বয়েস পর্যন্ত বাচ্চাদের বেশ আদর টাদর দিতে হয়, তারপর বারো বছর বয়েস পর্যন্ত খুব তাড়না করা দরকার। তোরা তা করিস না।

একটু থেমে আমি হেসে আবার বললাম, যেদিন টিভি-টা ভাঙল, সেদিন ভাই আমার ইচ্ছে করছিল, টেনে এক থাপ্পড় কষাতে। নিজের ছেলে হলে রাগ সামলাতে পারতাম না।

আহা, তুই তো ওকে শাসন করতেই পারিস। মাঝে মাঝে ওকে একটু পড়াবার চেষ্টা করে দেখ না। যদি মন বসে।

ওটা আমার দ্বারা হবে না। আমি বাচ্চাদের পড়াতে পারি না, অত ধৈর্য নেই।

অভি কিন্তু খেলাধুলোয় বেশ ভালো হয়েছে। স্কুল স্পোর্টসে প্রাইজ পায়। টেবিল টেনিসও বেশ ভাল খেলে।

সেটাও তো একদিক থেকে ভাল। সবাইকেই যে পড়াশুনোয় দারুণ হতে হবে, তার কোনও মানে নেই। খেলার জগতে যদি একেবারে ওপরের দিকে উঠতে পারে, তা হলে টাকা রোজগারের কোনও অসুবিধে হয় না, সমাজেও সম্মান পায়। আজকাল ক্রিকেট ট্রেনিং-এর অনেক সংস্থা হয়েছে, তার একটায় ভর্তি করে দিতে পারিস।

কিন্তু আমাদের মতন ফ্যামিলিতে কিছুটা লেখাপড়া না শিখলে কী চলে? দ্যাখ না, খেলোয়াড়দেরও ইংরিজি জানতে হয়। তুই বংশের ধারা মানিস না। অনেকেই কিন্তু বলে, একেবারে ফার্স্ট জেনারেশানে কিছুতেই লেখাপড়া মাথায় ঢোকে না। চাষা কিংবা কুলি-মজুরের ছেলেরা, যাদের বাপ-মা নিরক্ষর, সেই ছেলেরা স্কুল-কলেজে পড়লেও কি সুবিধে করতে পারে?

অম্বেডকরের কথা বুঝি তোর মনে নেই, অতীশ। আমাদের সংবিধান রচনা করেছেন তাঁর বাবা ছিলেন ভাঙ্গি, নিরক্ষর তো বটেই, অস্পৃশ্য মেথর জাতীয়।

ওরকম দু'একটা একসেপশান থাকে।

আমাদের বি এ অনার্সে পড়াতেন প্রফেসর সুবোধকান্তি শীল, পরে হার্ভার্ডে চলে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেই একদিন ক্লাসে বলেছিলেন, তাঁর বাবা কোনওদিন স্কুলে যাননি।

অতীশ এসব দৃষ্টান্ত গ্রাহ্য করল না।

একটু পরে নীলাঞ্জনা ঘরে ঢুকে, কাঁপতে কাঁপতে রক্তশূন্য মুখে বলল, জানো, কী দেখলাম। অভি আমাদের চাকরের কাছ থেকে বিড়ি চেয়ে নিয়ে খাচ্ছে। কী হবে?

অতীশ আমার দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন অনুচ্চারিত শব্দে বলতে চাইল, কুলি-মজুরের রক্ত যাবে কোথায়?

আমি বললাম, ও একবার টানলে কিছু হয় না। আমার জ্যাঠামশাই টয়লেটে বিড়ি খেতেন, সেখানে অ্যাশট্রেও থাকত। একদিন আমি জ্যাঠামশাইয়ের পরেই টয়লেটে ঢুকে দেখি একটা বিড়ি তখনও জ্বলছে। আমার তখন দশ-এগারো বছর বয়েস। সেই বিড়িটা তুলে কয়েক টান দিয়েই আমি খুব কেশেছিলাম, মনে আছে।

এ-কাহিনি শুনে স্বামী-স্ত্রী হেসে উঠল। অর্থাৎ আমার মতন এক বামুনের ছেলের অল্প বয়েসে একদিন বিড়ি টানাটা হাসির ব্যাপার। কিন্তু কুলি-টুলি কিংবা ধর্ষণকারীর রক্তে যার জন্ম, তার ব্যাপার অন্য।

এই রকম চলল কয়েক মাস।

অতীশ সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে নিজে গিয়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করে অনেক মিনতি করে আর একটা বছর সময় চাইল। অতীশ নিজে ওখানকার প্রাক্তন ছাত্র। তাই মান্য করা হল তার অনুরোধ। অভির জন্য দু'জন গৃহশিক্ষক রাখা হল, তাদের মধ্যে একজন আবার প্রাক্তন নকশাল, সে আবার গানও জানে, মাঝে মাঝে গুনগুন করে গান গায় আপন মনে। সে বছরে স্কুলে মাঝারি মানের রেজাল্ট হল অভির।

তার চমকপ্রদ পরিবর্তন হল তেরো বছর বয়েসে। দস্যিপনা তো আর করেই না, খেলাধুলোও ছেড়ে দিয়ে সে সর্বক্ষণ বই নিয়ে বসে থাকে। তার গল্পের বই পড়ার নেশা লেগে গেছে। তখন আবার তাকে তাড়া লাগানো হল খেলতে যাবার জন্য। সে যেতে চায় না। ইস্কুল থেকে ফিরেই সে গল্পের বই খুলে পড়তে শুরু করে।

এ সংবাদ শুনে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলাম। পড়ার নেশা একবার ধরলে, তা গল্পের বই হোক আর যাই হোক, সেই ছাত্র বা ছাত্রী পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেন্ড না হলেও ভালো ভাবে পাস করে যায়। এটা আমার অনেকদিনের অভিজ্ঞতা।

অতীশের পদোন্নতি হয়ে তখন সে পুরো সেক্রেটারি। কাজ বেড়ে গেছে অনেক, প্রায়ই তাকে দিল্লি যেতে হয়। নীলাঞ্জনাও একটা মহিলা সমিতিতে যোগ দিয়ে কিছু কিছু সমাজসেবার কাজে জড়িয়ে পড়েছে। ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কে ওদের আর দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। পরিও পড়াশুনোয় ভালো, তার আবার ঝোঁক গানের দিকে। এগারো বছর বয়েসে সে গানের জন্য একটা প্রতিযোগিতায় পুরস্কারও পেয়ে গেল।

অতীশদের পাশের ফ্ল্যাটটা খালি ছিল কিছুদিন। সেখানে বদলি হয়ে এলেন আর একজন সেক্রেটারি, অরণি মিত্র। তিনি আবার বিখ্যাত একজন কবির দৌহিত্র। তাঁর দুটি ছেলেমেয়ের মধ্যে বড় মেয়েটির নাম অপালা, সে ঠিক অভির সমবয়েসি, দু'জনে এক ক্লাসেই পড়ে। অবিলম্বে দুই পরিবারে ভাব হবার পর অপালা প্রায়ই অভির সঙ্গে পড়তে বসে। গল্পের বই বদলা-বদলি করে। অপালা বছরের পর বছর ফার্স্ট হওয়া ছাত্রী, তার প্রভাবেই যেন এতখানি পরিবর্তন এসেছে অভির স্বভাবে। দু'জনেই সদ্য পিউবার্টি পার হয়েছে, এর পর থেকেই তো ছেলেমেয়েরা পৃথিবীটাকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করে।

শরীর-সচেতনতা, আর যৌনক্ষুধা জাগার বয়েস এক এক দেশে, এক এক সমাজে এক এক রকম। আমাদের দেশেও তো মাত্র দেড়খানা শতাব্দী আগে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত। পাশ্চাত্য প্রভাবে আইন করে বিয়ের বয়েস বাড়ানো হয়েছে, যদিও গ্রামের দিকে ওসব আইন এখনও অনেকে মানে না। সেই পাশ্চাত্যে আবার বিয়ে ব্যাপারটাই

ঘর থেকেই বাগানের গেটটা দেখা যায়, বরুণা ফিরে আসছে
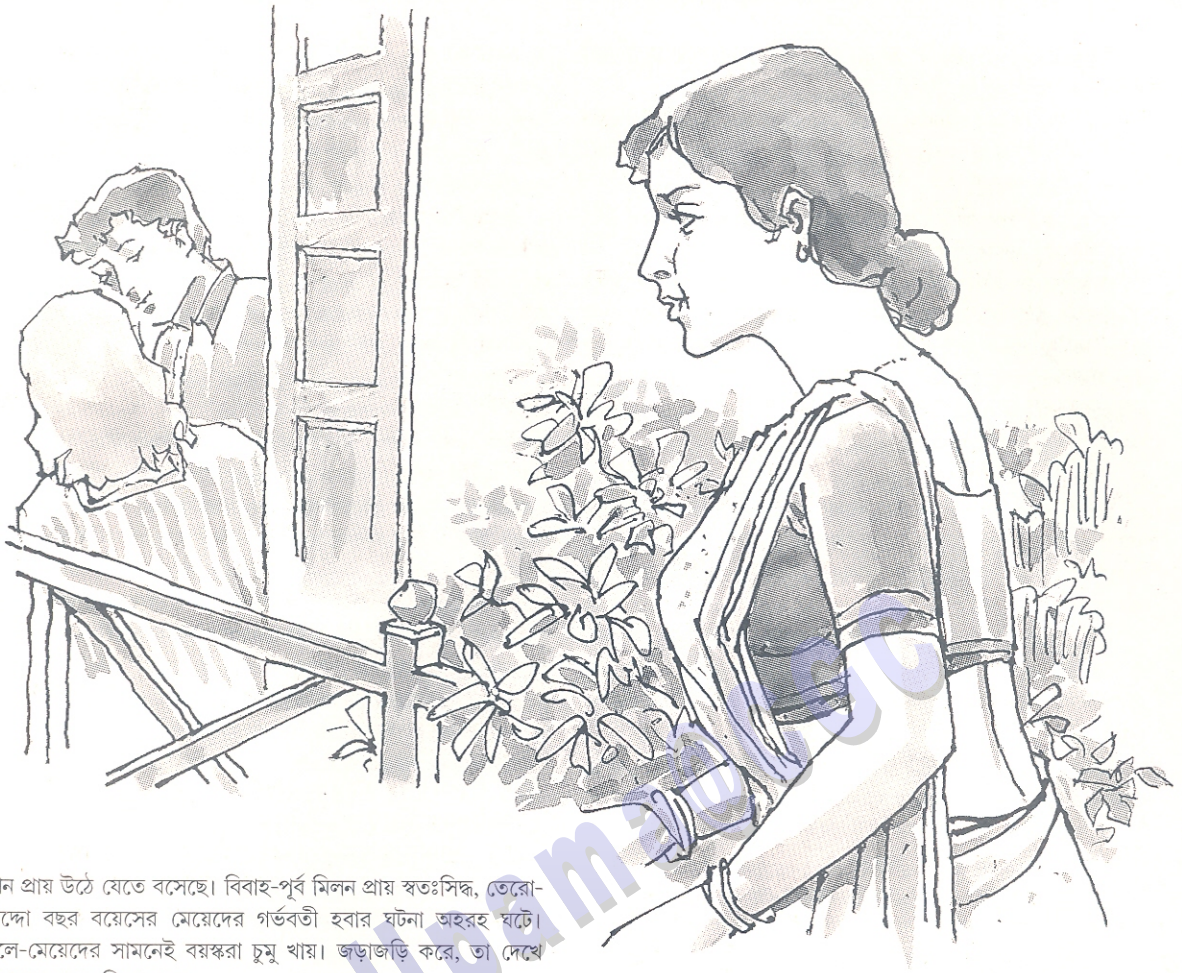
এখন প্রায় উঠে যেতে বসেছে। বিবাহ-পূর্ব মিলন প্রায় স্বতঃসিদ্ধ, তেরো-চৌদ্দো বছর বয়েসের মেয়েদের গর্ভবতী হবার ঘটনা অহরহ ঘটে। ছেলে-মেয়েদের সামনেই বয়স্করা চুমু খায়। জড়াজড়ি করে, তা দেখে বাচ্চারাও ওসব শিখে যায়।

আমাদের দেশে বাবা-মায়েরা এ ব্যাপারে সংযত, তাই স্কুলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যৌন-মিলনের ঘটনা খুবই বিরল। বরং ওও বয়েসে ছেলে ও মেয়েরা পাশাপাশি থাকলে রোমান্টিক চেতনার উন্মেষই স্বাভাবিক। সেটা স্বাস্থ্যকরও বটে।

অভি আর অপালা অনেকখানি সময়ই একসঙ্গে কাটায়, কিন্তু তাদের মধ্যে যাকে বলে অসভ্যতা, সেরকম কিছুর প্রয়াস দেখা যায়নি।

একদিন অভি আমাকে জিজ্ঞেস করল, অংশুকাকা, তুমি ইলিয়াড পড়েছ?

আমি একটুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলাম। যে-ছেলেটি এক ধাক্কায় টিভি ভেঙে ফেলেও একটুও কাচুমাচু হয়নি, এ যেন সে নয়। লম্বা হতে শুরু করেছে, ভাঙছে কণ্ঠস্বর, চওড়া কাঁধ ও কব্জি, মুখমণ্ডলে লাজুক ও বিনীত ভাব। গায়ের রং কালো ঠিকই, কিন্তু তাতে লেগেছে সভ্যতার পালিশ। বড় বড় চোখ ও উন্নত নাক, এ ছেলে একসময় সুপুরুষ হিসেবে গণ্য হবে।

ওর প্রশ্ন শুনে আমি বললাম, হ্যাঁ পড়েছি অনেক আগে। ভালো মনে নেই। কেন বল তো?

অভি বলল, হেক্টর আর অ্যাসিলিসের মধ্যে তুমি কাকে সাপোর্ট করো?

আমি বললাম, যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপার, আলাদা ভাবে কাউকেই ঠিক ... তোর কাকে পছন্দ?

অভি জোর দিয়ে বলল, হেকটর। ওকে অন্যায়ভাবে মারা হয়েছে।

আমার মনে পড়ল, খুব অল্প বয়েসে অভি এসে ওর বাবাকে বলেছিল, ইন্দ্রজিৎ আর লক্ষণের মধ্যে ও ইন্দ্রজিতেরই পক্ষপাতী। ও হেরে যাওয়া বীরদের পছন্দ করে। এর পর যদি মহাভারত পড়ে, তাহলে খুব সম্ভবত অর্জুনের চেয়ে ও কর্ণকেই বেশি সমর্থন করবে। এটা কি জিন-এর প্রভাব?

অভির সঙ্গে ওর পড়ার ঘরে গিয়ে বই-পত্র দেখলাম। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে, এই বয়েসে ইংরিজি বই-ই বেশি পড়বে, সেটাও স্বাভাবিক। তবে বাংলা বইও কিছু আছে। রাজশেখর বসুর গল্প সংগ্রহ দেখে আমি বললাম, তোকে আমি রাজশেখরের মহাভারত কিনে দেব, আস্তে আস্তে পড়বি।

এরপর মাঝে মাঝেই অভির সঙ্গে আমার নানান গল্পের বই নিয়ে আলোচনা হয়।

একদিন সকালবেলা অতীশ হঠাৎ আমার সল্টলেকের সেই ফ্ল্যাটে এসে হাজির। আগে কখনও আসেনি, আমিই তো যাই ওদের কোয়ার্টারে।

অতীশ বলল, এদিকে চিফ মিনিস্টারের কাছে আসতে হয়েছিল, তিনি আজ বিদেশে যাচ্ছেন। তারপর ভাবলাম, দেখে আসি। তুই একা একা কীভাবে থাকিস। কে তোর রান্না করে দেয়?

আমি বললাম, তোকে চা আর ডিমভাজা আমি নিজেই করে খাওয়াতে পারি। সাড়ে দশটার সময় একজন মহিলা এসে দুপুরের রান্নাটা করে দিয়ে যান। রাত্তিরটা কোনও রকমে চলে যায়।

অতীশ বলল, বয়েস তো কম হল না, এখনও ব্যাচেলরের জীবন! তুই আর বিয়ে থা করবি না?

বিয়ে করবই না। এমন কোনও পণ করিনি। কাউকে যদি পছন্দ হয় ... দেখা যাক!

মেয়েদের সঙ্গে না মিশলে পছন্দ হবে কী করে? আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে ক্যালকাটা ক্লাবে গেলেই পারিস, দারুণ দারুণ মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

ক্যালকাটা ক্লাবের কোনও মেয়েকে আমি বিয়ে করব! স্নো-পমেটমের খরচই তো জোটাতে পারব না।

আজকাল কোনও আধুনিক মেয়ে স্নো মাখে না। এখন নানা রকম ক্রিমের রাজত্ব। আর পমেটমের কেউ নামই শোনেনি। ওসব তো আমরাও বইতে পড়েছি।

আমার মনে হল, অতীশ আমার এখানে শুধু এসব কথা বলার জন্য আসেনি। অন্য কোনও কথা আছে।

চা-ডিমভাজা বানিয়ে দেবার পর জিজ্ঞেস করলাম, আর কী খবর বল।

অতীশ একটু ইতস্তত করে বলল, তোর কাছে একটা পরামর্শ চাই অংশু। ক'দিন ধরেই আমি একটা কথা ভাবছি। তোর সঙ্গে আলোচনা না করে নীলাকেও কিছু বলতে চাই না। অভি বড় হচ্ছে, ওকে কি ওর আসল পরিচয়টা জানিয়ে দেওয়া উচিত? মানে, অন্য কারও কাছ থেকে যদি শোনে ... তার চেয়ে আমাদেরই জানিয়ে দেওয়া কি ঠিক নয়?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখনও অভি কিছুই জানে না?

অতীশ বলল, না। কিছুই না। আমাদের ব্যবহারে কি কিছু তফাত আছে? আমরা অপরাজিতার বায়োলজিকাল পেরেন্ট, কিন্তু অভিনবকে আলাদা চোখে দেখার কথা আমরা কখনও মনেও স্থান দিইনি। না, ছেলে এখনও কিছু জানে না।

আমি বললাম, ডাক্তার-টাক্তার কারও মতামত নিলেই পারিস। আমার এ ব্যাপারে কোনও অভিজ্ঞতা নেই। তবে আজকাল নাকি ক্যানসার পেশেন্টদের কাছেও রোগের কথা গোপন করা হয় না। জানলে তবু মনের জোর বাড়ে।

আমার ভয় হয় অংশু। যদি ছেলেটা এ-কথা জানার পর হঠাৎ বদলে যায়? তোর কথা মিলে গেছে, ওর আসল বাবাটা একটা বদ লোক হলেও ওর রক্তের ধারায় সেই পরিচয় ফুটে ওঠেনি। পরিবেশের জন্যই সভ্য, স্বাভাবিক হয়েছে। এখন হঠাৎ আঘাত পেলে!

সেই যে চাণক্য শ্লোকে আছে, প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে, পুত্র মিত্রবদাচরেৎ। অর্থাৎ ষোলো বছর বয়েস হলে ছেলের সঙ্গে বন্ধুর মতন আচরণ করতে হয়। ষোলো বছর বয়েসে বুদ্ধিবৃত্তি অনেকটা পরিপূর্ণতা লাভ করে। এখন অভি নিশ্চয়ই বুঝবে, যে মা-বাবা ওকে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, তাদের কথা ওর মনে রাখবার দরকার নেই। যারা ওকে স্নেহ-মমতায় মানুষ করেছে, শিক্ষার সুযোগ দিয়েছে, জীবনে কোনও অভাবই রাখেনি, তারাই ওর আসল মা আর বাবা। মহাভারতের কর্ণ, সে যে কুন্তীর সন্তান তা জানবার পরেও নিজেকে সে অধিরথপুত্র বলে গর্ব করেছিল। কুন্তীর মুখের ওপর বলে দিয়েছিল, অধিরথ আর রাধাই তার মা-বাবা।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গোরা? জন্মপরিচয় জানবার পর সে কী কাণ্ডই করল! তাই আমার ভয় হয়।

গোরার ব্যাপারটা ছিল ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপার। কিন্তু পালিতা মাকেই সে শেষ পর্যন্ত মা বলেছে।

আর তিন মাস পরেই অভির ষোলো বছরের জন্মদিন।

তখন দ্যাখ, আস্তে আস্তে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে ... অন্য কারও মুখ থেকে জানার চেয়ে তোর মুখ থেকে শুনলে তার রি-অ্যাকশান অবশ্যই ভালো হবে!

তবু নীলাকে তো আমায় জিজ্ঞেস করতেই হবে! ওর মতামত না নিয়ে তো কিছু করা যাবে না! নীলার আবার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

অভিকে জানালে তার পরিণাম কী হবে, তা বোঝার আগেই নীলাঞ্জনা এ প্রস্তাবের সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া মাত্রই তীব্র আপত্তি তো জানাল বটেই, আরও অসুস্থ হয়ে একেবারে শয্যাশায়ী। ফলে মুলতুবি হয়ে গেল এখনকার মতন।

অভির ষোলো বছরের জন্মদিন পালন করা হল বেশ সাড়ম্বরে। তখনও নালাঞ্জনা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না।

নীলাঞ্জনাকে নিয়ে চিকিৎসকরা যখন বেশ চিন্তিত, তার মধ্যেই ধরা পড়ল অতীশের ক্যানসার। ধূমপান ছেড়ে দিয়েছে আঠেরো বছর আগে, তবু ক্যানসার হয়েছে তার ফুসফুসে। আর সেই রোগ তাকে বেশি সময় দিল না।

অতীশকে চিকিৎসার জন্য মুম্বইতেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানকার ডাক্তাররাও ভরসা দিতে পারলেন না। কলকাতায় ফিরিয়ে আনার দেড় মাসের মধ্যেই অতীশকে ছেড়ে যেতে হল এই পৃথিবী। সামনের বছরই তার চিফ সেক্রেটারি হবার কথা ছিল।

শেষের কয়েকটা দিন আমি রোজ সকাল-বিকেলে নার্সিংহোমে অতীশের মাথার কাছে বসে থাকতাম। এর মধ্যে দু'বার সে আমার হাত চেপে ধরে বলেছিল, অংশু, তোর ওপর ভার দিয়ে গেলাম, যদি তুই মনে করিস, অভিকে তার পরিচয় জানানো দরকার, তুই তো গোড়া থেকেই সব দেখেছিস, নীলাকেও তুই বোঝাতে পারবি ...

হিন্দু মতেই সব নিয়ম মেনে শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পন্ন হল অতীশের। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে অভিই মুখাগ্নি করেছে।

অভির পূর্ব পরিচয় জানার মতন মানুষও এখন আর বিশেষ কেউ নেই। অতীশ নিজের বাবা-মাকে হারিয়েছিল অনেক কম বয়েসে। সে মামাবাড়িতে মানুষ। নীলাঞ্জনার বাবা মা বেঁচে ছিলেন অভিকে দত্তক নেবার সময়, তাঁরা অবশ্য সবটা জানতেন না। এখন তাঁরাও বিগত হয়েছেন।

শুধু জানেন বেলামাসি। তাঁর এখন অনেক বয়েস হলেও নিশ্চিত মনে আছে সব কিছু। তিনি এখন প্রাইভেট প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরপুকুর ক্যানসার রিসার্চ সেন্টারে সেবামূলক কাজ করেন।

অতীশের শ্রাদ্ধের সময় অভি যখন মাথা ন্যাড়া করে মন্ত্র পাঠ করছে, তখন বেলামাসি দাঁড়িয়েছিলেন আমার পাশে। কয়েকবার তিনি তাকিয়েছিলেন আমার চোখের দিকে, আমরা একটাও বাক্যবিনিময় করিনি।

পিতৃবিয়োগ এবং সেই সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার ধাক্কায় অভি যেন আরও বয়স্ক হয়ে উঠল, তার ব্যবহারে ফুটে উঠল দায়িত্বজ্ঞান। মাকে ও ছোট বোনকে সেই সামলাল। কয়েক মাস পরে সরকারি ফ্ল্যাট ছেড়ে ওরা চলে গেল সোনারপুরে অতীশের পৈতৃক বাড়িতে। সেটা বেশ বড় বাড়ি, ওদের টাকাপয়সার কোনও অসুবিধে হবারও কথা নয়।

যথা সময়ে অভি আই এস সি-তে ভাল রেজাল্ট করে জয়েন্ট পরীক্ষা দিল। ওপরের দিকে স্থান পেয়ে ভর্তি হল খড়্গপুরের আই আই টি-তে।

আমার সঙ্গে যোগাযোগ কমে গেল। অভির সঙ্গে তো দেখাই হয় না, নীলাঞ্জনাকে প্রথম দেখতে গেছি কয়েকবার, তারপর আর যাব যাব করে যাওয়াটা পিছিয়ে যায় অনবরত। মৃত বন্ধুর স্ত্রীর কাছে নিয়মিত যাওয়া আসা করতে হলে আর একটু বাড়তি কিছু সম্পর্ক বা তার স্মৃতি থাকা দরকার বোধহয়। নীলাঞ্জনার সঙ্গে কখনও আমার একটিবারও মধুর রসের বিনিময় হয়নি।

এর মধ্যে আমাকে চলে যেতে হল বাঙ্গালোর। একটা পড়াবার চাকরি নিয়েই। ফিরলাম বছর তিনেক পর। একদিন মেট্রো রেলে একটি যুবতী মেয়ে আমাকে অংশুকাকা বলে ডাকতেই আমি চমকে উঠেছিলাম, তাকে একেবারেই চিনতে পারিনি। সে অপরাজিতা। পিউবার্টির পর ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের চেহারাতেই বেশি বদল ঘটে। তবে রং অত ফর্সা হলেও মেয়েটি তেমন রূপসী হয়নি, মুখখানা ল্যাপাপোঁছা ধরনের। সে পড়াশুনো করছে, গানও গাইছে, একটা টিভি সিরিয়ালে সে নেপথ্যসঙ্গীত গায়িকা।

তার কাছ থেকে তার মা ও দাদার খবর নিলাম। অভি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতেই চাকরি পেয়ে গেছে টাটা কোম্পানিতে। নীলাঞ্জনা মাঝেমাঝে এখন জামসেদপুরে ছেলের কাছে গিয়ে থাকে। শরীর সারেনি, এখন সে হুইল চেয়ার ছাড়া দূরে যাতায়াত করতে পারে না।

অপরাজিতা নেমে গেল পার্ক স্ট্রিটে। সে অত বড় হয়ে গেছে, তা দেখার পর টের পেলাম, আমারও কত বয়েস বেড়েছে। ছেলেমেয়েরা যত বড় হয়, ততই বাবা-মায়েরা ঢলে পড়ে মৃত্যুর দিকে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। আমাকে তো যে-কোনও লোক দেখলে এখন বুড়োই ভাববে, অথচ

মনে মনে তা অনুভব করি না। যৌনক্ষমতা ঠিকঠাক আছে কি না, তা প্রমাণ করবার জন্য মাঝে মাঝে কোনও বান্ধবীকে ডাকতে হয়। গল্প-উপন্যাসে যতই গুরুত্ব দেওয়া হোক, আজকাল অনেক বিবাহিত মহিলাই অন্য পুরুষের সঙ্গে এক আধবার শোওয়া-শুয়ির ব্যাপারটায় আবেগ মেশাতে চায় না। অপরাধবোধের তো প্রশ্নই নেই। যেন নিতান্তই একটা খেলা।

সল্টলেকে আমার সেই বন্ধুর ফ্ল্যাট এর মধ্যে ভাড়া দেওয়া হয়ে গেছে। আমাকে একটা ফ্ল্যাট নিতে হল। যোধপুর পার্কে। বাঁধা চাকরি আর করবই না ঠিক করেছি। এর মধ্যে কিছু লেখালিখির ফলে মার্কেট স্টাডিতে আমার কিছুটা খ্যাতি হয়েছে। সেই সুবাদে বিভিন্ন কোম্পানি আমাকে কনসালটেন্সির জন্য ডাকে। সুতরাং, আমার রুজি-রোজগারের কোনও অভাব নেই।

আমি যখন যেখানেই থাকি, কিংবা বাড়ি বদলাই, আমার ফোন নাম্বার ঠিক পেয়ে যায় বরুণা। সিরাজুল তারিখ এখন জে এন ইউ-এর নাম করা অধ্যাপক, বরুণারা অনেক বছর ধরে দিল্লি প্রবাসী। মাসে দু'বার অন্তত সে আমায় ফোন করবেই। স্বামীর কাছ থেকে গোপন করেও নয়, অনেক সময় বুঝতে পারি, সিরাজুল সাহেব পাশেই বসে আছেন। কখনও কখনও তিনিও কথা বলেন। আমাকে দিল্লি যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

আমি, বরুণার ছেলেকে যাতে না দেখতে হয়, সেই জন্য একবারও দিল্লি যাইনি। নিজের কাজের প্রয়োজন হলেও কাটিয়ে দিই। ওদের আর দ্বিতীয় সন্তান জন্মায়নি। বরুণা এখন প্রায়ই আমাকে বলে, স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে সত্তর ভাগ আনুগত্যই ঠিক। বাকি তিরিশ ভাগ অন্যদের জন্য না রাখলে বিবাহিত জীবনে রসের ভাটা পড়ে। তার এখন অন্য পুরুষ বন্ধু আছে। সিরাজুল সাহেবেরও আছে এক বান্ধবী।

আমার আর বিয়েটা করা হল না। সে বয়েসও পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আমি ঠিক ব্রহ্মচারী থাকিনি। তবু, বরুণার সেই তিরিশ ভাগ খোলামেলা জীবনের অংশ নিতে আমার কখনও ইচ্ছে হয়নি। দূর থেকে বরুণা আমার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেয় নিয়মিত। সেই বেশ।

একদিন ডাকে একটা বিয়ের চিঠি পেলাম। তার পরের দিনই অভি আর পরি এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। বুঝলাম, ওদের মা-ই জোর করে পাঠিয়েছে। আমার মতন একজন পুরনো পিতৃবন্ধুকে শুধু চিঠি দিয়ে নিমন্ত্রণ করা ভালো দেখায় না।

অভি বিয়ে করছে অপালাকে। ওদের অনেক দিনের বন্ধুত্ব। খুব খুশির খবর তো নিশ্চিতই। অনেকদিন পর অভির সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্প হল। ওর ভবিষ্যতের অনেক পরিকল্পনা। বলাই বাহুল্য, ও জামসেদপুরে বেশিদিন পড়ে থাকতে চায় না। ভালো রেজাল্ট করা ইঞ্জিনিয়ার, সে তো বিদেশে পাড়ি দেবেই। একসময় এইসব ভাল ছাত্ররা যেত ইংল্যান্ড কিংবা জার্মানিতে, এখন যায় আমেরিকা কিংবা কানাডায়। ওখানে সুযোগ অনেক বেশি। অভি বেশ কয়েকটা জায়গায় রিসিউম পাঠিয়েছে, আশাব্যঞ্জক উত্তরও পেয়েছে। বছরখানেকের বেশি অপেক্ষা করতে হবে না।

আজকাল প্রথমে রেজিস্ট্রি হয়, তারপর সামাজিক অনুষ্ঠান। দু'জায়গাতেই উপস্থিত ছিলাম আমি। বেলা মাসিও এসেছিলেন।

অতীশ আমাকে অনুরোধ জানিয়েছিল, প্রয়োজন হলে আমিই যেন অভিকে তার পূর্বপরিচয় বা জন্মপরিচয় জানিয়ে দিই। সে প্রয়োজন আমি কখনও বোধ করিনি, সে দায়িত্বও আমি নিতে চাই না। এবারেও এই বিষয়ে বেলামাসির সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি। অভি সত্যি একজন সুপুরুষ, যোগ্য পুরুষ হয়েছে। বহু কুসংস্কারের জ্বলন্ত প্রতিবাদ।

মাস ছয়েক বাদেই অভি একা এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। বিশেষ আনন্দে উদ্ভাসিত তার মুখ। আমেরিকার একই শহর থেকে স্বামী ও স্ত্রী দু'জনের নামেই আলাদা নিয়োগপত্র এসে গেছে। এমন সুসংবাদ আর হয় না। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই ওদের চলে যেতে হবে। আবার কবে দেখা হবে, না হবে, তাই বিদায় নিতে এসেছে আমার কাছে। আমিও খুশি মনে নানান খোঁজ খবর নিতে লাগলাম।

খানিক বাদে অভি বলল, একটাই মুশকিল হয়েছে, অংশুকাকু। তোমাকে খোলাখুলি বলছি, আর বিশেষ কেউ জানে না। অপালা পাঁচ মাসের প্রেগন্যান্ট, যাবার আগে অ্যাবরশান করিয়ে যেতেই হবে।

আমি চমকে উঠে বললাম, কেন, ওটা না করে, আর কিছুদিন পরে গেলে হয় না?

অভি বলল, তুমি জানো না অংশুকাকু, আজকাল ভিসার ব্যাপারে কী রকম কড়াকড়ি। শুধু আমার চাকরি হলে ওকে কিছুতেই ভিসা দিত না। অ্যাপ্লাই করে অপেক্ষা করতে হয়, অন্তত দু-তিন বছর লেগে যায়। ওকে ওইভাবে রেখে যেতে আমি পারতাম না। এখন লাকিলি, ও নিজেও একটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ পেয়ে গেছে, এখন আলাদাভাবে ওর ভিসা পেতে কোনও অসুবিধে নেই। এই সেপ্টেম্বরেই ওকে জয়েন করতে হবে। ওদেশে গিয়ে তিন-চার মাসের মধ্যেই লম্বা ছুটিই বা নেবে কী করে? আমিও, মানে, দু'জনেই ওখানে বাচ্চা হলে নানান ঝামেলায় পড়ব। প্রথম প্রথম গুছিয়ে নিতেই অনেক অসুবিধে হয়।

আমি চুপ করে রইলাম।

অভি আবার বলল, ওদেশে অ্যাবরশান লিগ্যাল নয়। আমাদের দেশ সে দিক থেকে অনেক সিভিলাইজ্‌ড। সহজেই অ্যাবোরশান করানো যায়।

আমি বললাম, পাঁচ মাস ... এই সময় তো বাচ্চাদের শরীরটা ফর্ম করে যায়, তখনও কি ... কোনও অসুবিধে ...

অভি সমস্যাটা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, সে ম্যানেজ করা যায় ওসব এখন জল-ভাত। তিন-চারদিনেই ফিট হয়ে যাবে। অপালারও এটাই ইচ্ছে!

স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই যা চায়, সেখানে আমার নাক গলাবার কোনও অধিকার নেই। আমি আপত্তিই বা করব কেন? গর্ভপাত তো এক ধরনের ব্যক্তিস্বাধীনতা। বিশেষত মেয়েদের।

খানিক বাদে অভি আমার হাত ঝাঁকিয়ে বলল, চললাম অংশুকাকু। তুমি ভালো থেকো!

ও চলে যাবার পর আমি কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম। কয়েক মিনিট পরেই বৃষ্টি নামল। আমার তিনতলার এই ফ্ল্যাটটা থেকে কাছেই দুটো বড় বড় গাছ দেখা যায়। বৃষ্টির সময় গাছের পাতায় যে টুপটাপ শব্দ হয়, সেই শব্দ ছোটবেলা থেকেই আমার খুব প্রিয়। এখনও বৃষ্টির সময় বারান্দায় এসে দাঁড়াই।

আজ আর উঠলাম না। বৃষ্টির শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছি না। শুধু তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে। বৃষ্টি বাড়ছে ক্রমশ।

পাঁচ মাসের শিশু, তার প্রাণ ধুকপুক করে। গর্ভিনীর পেটে কান পাতলে শোনাও যায়। সেরকম একটা শিশুকে মেরে তার লাশটা কোথায় ফেলা হয়, আমি জানি না।

আমার বুকের মধ্যে একটু ব্যথা ব্যথা হচ্ছে। কী যেন একটা ভুল করেছি আমি। এতেই প্রমাণ হয় অংশুমান চৌধুরী বেশ বুড়ো হয়ে যাচ্ছে।

অঙ্কন: নির্মলেন্দু মণ্ডল